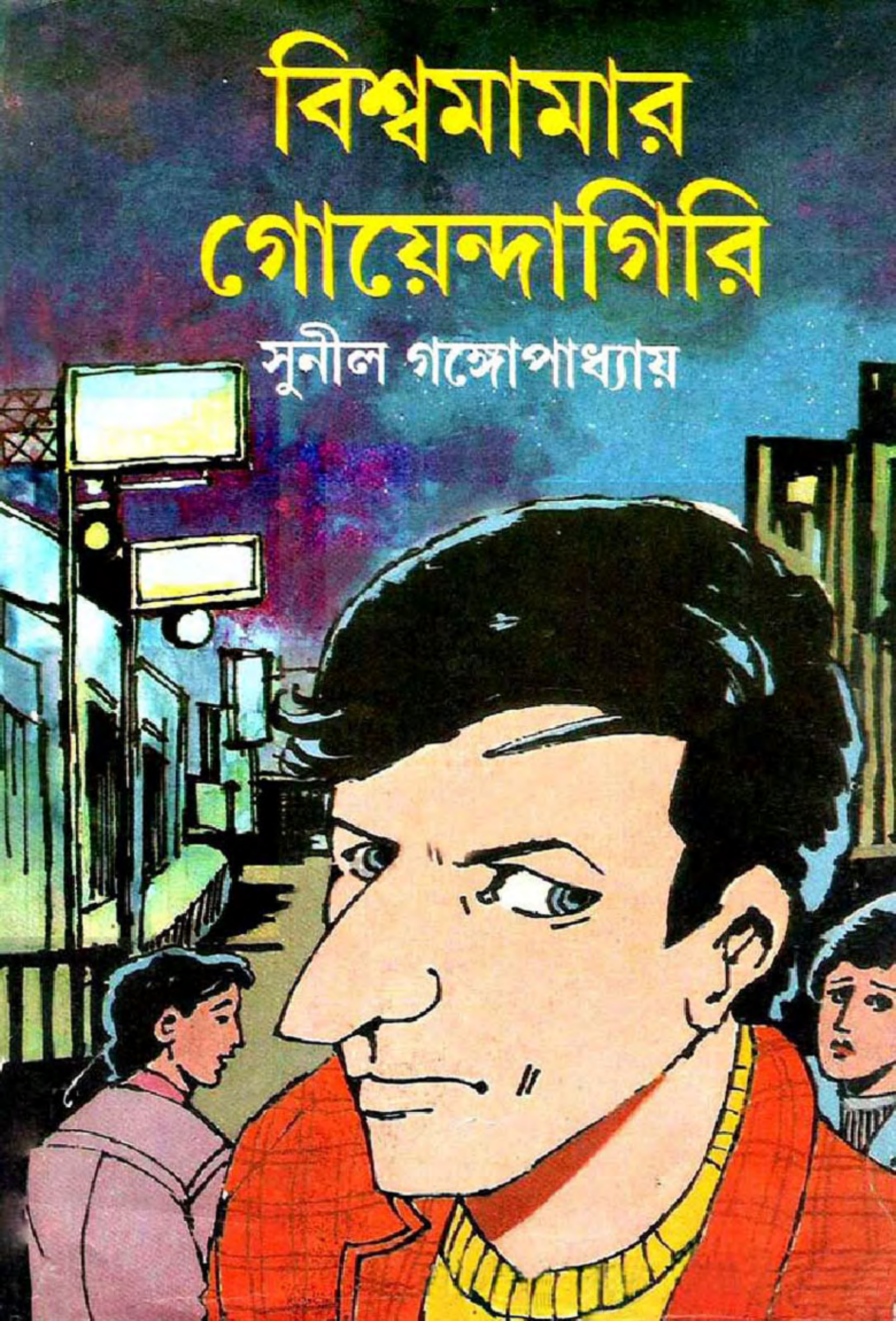
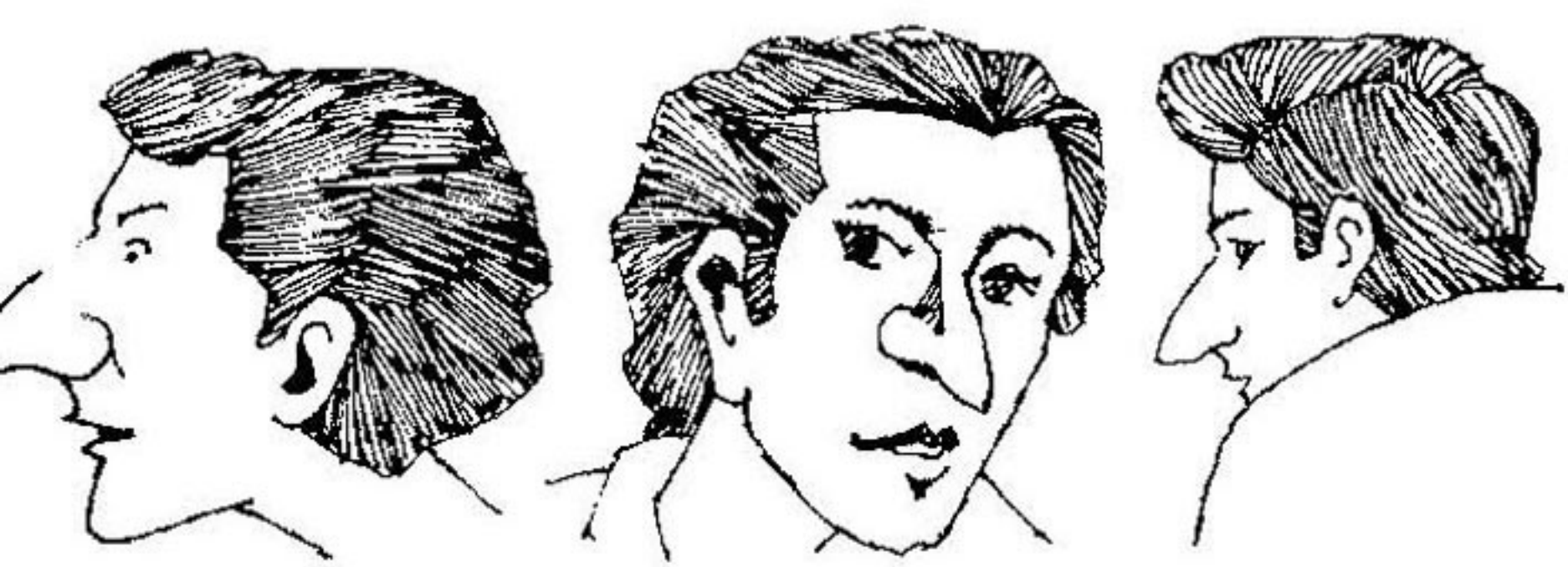
বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়





বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১, মহাত্মাগান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মাগান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রকাশনা পরামর্শ ঃ অধীর চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭
প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

দাম ঃ কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর ঃ
বঙ্গী পিণ্টার্স্
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

বিশ্বমামা নামকরা বিজ্ঞানী হলে কী হবে, বাড়ির মধ্যে একেবারে ছেলে মানুষ। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালো বাসেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কম্পিটিশন শুরু করে দেন। আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞানের কঠিন প্রবন্ধ লিখতে লিখতে হঠাৎ বিলু ও নীলুকে ডেকে নিয়ে লুডো খেলতে বসে যান। আবার কখনো কখনো গবেষণার কাজে এমন ডুবে যান যে নাওয়া-খাওয়াও যান ভুলে।

দেখতেও অন্যসব বিজ্ঞানীদের মতন নয়। দাড়ি গোঁফ নেই, মাথায় টাকও নেই। গায়ের রঙ ধপধপে ফরসা। লম্বা ছিপছিপে চেহারায় নাকটাই যা একটু বেশি লম্বা। কথাবার্তা একটু অদ্ভুত শোনালেও সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

হাজারিবাগের জঙ্গলে পেট্রল ফুরিয়ে গেলে সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া পাথর গলিয়েই পেট্রল সংগ্রহ করে নিলেন বিশ্বমামা। আর সেই পাথরগুলোই যে 'অয়েল স্যান্ড' তা কি আমরা জানতাম!

বিশ্বমামার আবির্ভাব শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (১৯৯০)-এর পাতায়।

পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই হয়তো চরিত্রটি সৃষ্টি করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এতদিন ধরে বিশ্বমামার নানা কীর্তিকলাপ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতাতেই আটকে ছিল। সেই সব কাহিনী নিয়েই এই প্রথম 'বিশ্বমামার গোয়েন্দাগিরি' প্রকাশিত হল। ঘনাদা-টেনিদা-ফেলুদার মতোই সকলের আপনজন বিশ্বমামার গল্প শুনতে ছোটরা যে হৈ হৈ করে ছুটে আসবে এতে আর আশ্চর্য কি!

কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭ প্রকাশক



বিশ্বমামার

রহস্য ৫
হায় হায় ১৪
আবিষ্কার ২২
কারসাজি ৩২
ম্যাজিক ৪০
গোয়েন্দাগিরি ৪৮

বিশ্বমামার রহস্য

আমার বিশ্বমামা প্রায় সারা বিশ্বেরই মামা।

আমার মা-মাসিরা সাত বোন। তাদের ঐ একটিই ভাই। আমরা মাসতুতো ভাই-বোনেরা মিলে উনিশ জন, আমাদের সকলের ঐ একমাত্র মামা। আমাদের দেখাদেখি পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওকে মামা বলে ডাকে।

বিশ্বমামা প্রায়ই দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিতে যায়। বিদেশীরা ওর নামটা ঠিক মত উচ্চারণই করতে পারে না। তারা বিস্ওয়া বিস্ওয়া বলে। তাই বিশ্বমামা অনেককে বলেন, কল্ মী মামা, এটা আমার ডাক নাম। মামা বলাটা বেশ সোজা। তাই বিশ্বমামা অনেক সাহেব-মেমদেরও মামা বনে গেছে।

বিশ্বমামা বেশ আমুদে মজার মানুষ।

যদিও খুব নামকরা বিজ্ঞানী। দেশ-বিদেশে খুব খাতির। কিন্তু বাড়ির মধ্যে একেবারে ছেলেমানুষের মতন। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালোবাসেন। সিঁড়ি দিয়ে এক সঙ্গে নামবার সময় হঠাৎ বলেন, কম্পিটিশান দিবি, কে আগে নামতে পারে? বলেই দুদ্দাড় করে দৌড়তে শুরু করেন। দারুন শক্ত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতে উঠে এসে বলেন, এই লুডো খেলবি?

বাইরের লোকরা অবশ্য কেউ এই সব কথা জানে না।

সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের দাড়ি থাকে, গোঁফ থাকে, মোটা কাচের চশমা আর মাথায় থাকে টাক। বিশ্বমামার কিন্তু দাড়ি গোঁফ কিচ্ছু নেই। আজও তার চশমা লাগে না, মাথায় চুলও যথেষ্ট। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। নাকটা একটু বেশী লম্বা। গায়ের রং বেশ ফর্সা বলে ছোটবেলায় ওঁকে অনেকে বলতো, নাকেশ্বর ধপধপে। এখন অবশ্য এই নামটা আর বিশেষ কেউ বলে না।

তবে আমরা জানলুম কী করে?

বিশ্বমামা মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়া ভুলে গবেষণার কাজে ডুবে থাকলে আমার মা বলত, এই নাকেশ্বর ধপধপে, তোর কি খিদে - তেষ্টা কিছু নেই?

একটা কিছু আবিষ্কার কর দেখি. যাতে মানুষের খিদের সমস্যা ঘুচে যায়।

বিশ্বমামার অনেক গুণ কিন্তু একটা খুব বড় দোষ থাকে। কিছুতেই কোনো কথার সোজাসুজি উত্তর দেন না! এক সময় তাতে আমাদের খুব রাগ ধরে।

এই যেমন বিশ্বমামা এক বছরের জন্য ক্যানাডায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন কয়েকদিন আগে। আমি জিজ্ঞেস করলাম। বিশ্বমামা তুমি ওখানে নায়েগ্রা ফলস দেখেছো?

বিশ্বমামা চোখ বড় বড় করে বললো, ওরে বাবা, এবারে কী হয়েছিল জানিস? ওরা আমায় ধরে রাখতে চাইছিল, প্রায় জোর করে।

আমি বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম, ওরা মানে কারা? নায়েগ্রার কাছে কারা তোমায় ধরে রাখতে চেয়েছিল?

বিশ্বমামা বললেন, অ্যাথাবাস্কা !—অ্যাথাবাস্কা ! বলে কি, তুমি এইখানে থাকো, মামা, তোমাকে অনেক টাকা-পয়সা দেবো! বিরাট বাড়ি দেবো, নতুন গাড়ি দেবো, যা তুমি চাও ! এখানে থেকে তুমি ঐ কাজটা করো। আমি বললুম, উঁহু, সেটি হচ্ছে না। আমি নিজের দেশে ফিরে এই কাজ করবো। আমার দেশের যাতে উপকার হয়—সেটা আমি দেখবো না?

বোঝ ঠ্যালা ! কোথায় নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর কোথায় অ্যাথাবাস্কা !

যাই হোক, নায়েগ্রার কথাটা মুলতুবি রেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাজ মানে কী কাজ? কিসে আমাদের দেশের উপকার হবে?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললো, হাজারিবাগে ছোড়িদিদের খবর কী রে? ভাবছি, সেখানে একবার বেড়াতে যাবো!

এসব বোঝে কার সাধ্য!

এসব কথা শুনলে মনে হয় খুবই এলোমেলো, কিংবা বিশ্বমামার মাথার গোলমাল আছে, আসলে কিন্তু তা নয়। এই সব কথার মানে বোঝা যায় কয়েকদিন পর।

ক্যানাডা থেকে বিশ্বমামা এবার এক বাক্স-ভর্তি পাথর নিয়ে এসেছেন। সেগুলো কিছু দামি পাথর বলে মনে হয় না। এমনি সাধারণ বেলেপাথরের মতন। ছোট, বড়, নানান রকমের টুকরো।



অত দুর থেকে বয়ে এনেছেন পাথরগুলো। কিন্তু নিজের ঘরে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখেছেন। একটা দুটো কেউ নিয়ে গেলেও যেন ক্ষতি নেই। কিন্তু কেই বা নেবে? ক্যানাডার পাথর বলে আলাদা করে তো কিছু বোঝা যায় না। ওরকম পাথর আমাদের এখানেও কত পাওয়া যায়।

একদিন দুপুরে বিশ্বমামার ঘরে গিয়ে দেখি যে সব কটা জানলা বন্ধ। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে বিশ্বমামা কী সব লিখছেন। একটু উঁকি মেরে দেখলুম, দারুন কঠিন সব অঙ্ক।

কিন্তু দিনের বেলায় এরকম জানলা বন্ধ রাখার কী মানে হয়? বাইরে বেশি লোকও নেই, বেশ মেঘলা-মেঘলা সুন্দর দিন।

আমি একটা জানলা খুলতে যেতেই বিশ্বমামা চেঁচিয়ে উঠে বলল, খুলিস না ! খুলিস না ! জানলা খুললে বিপদ হতে পারে। দেখছিস না। আমি তিন চারদিন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি না একদম ! ওরা বেধহয় আমাকে খুন করতে চায়!

আমার পিলে চমকে উঠলো খুব! কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

কিন্তু বিশ্বমামা এমনভাবে বললেন, যেন খুনটা কিছুই না। কেউ যেন সন্দেশ খেতে চায় কিংবা দোলনায় দুলতে চায়!

আমি বললুম, কারা তোমাকে খুন করতে চায়! তাহলে তো এক্ষুণি খবর দিতে হবে!

বিশ্বমামা বললেন, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। এখন কাছাকাছি কী পূজো আছে বল তো? কুমোরটুলিতে এখন কী মূর্তি গড়া হচ্ছে?

—কুমোরটুলীর মূর্তি!

—তুই এক কাজ করতো, নীলু। তোকে আমি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি। কুমোরটুলী থেকে আজই একটা মূর্তি কিনে নিয়ে তো! ও হ্যাঁ, শিগগিরই তো বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মার মূর্তি হলেই চলবে। শুধু নাকটা একটু বেশি লম্বা করে দিবি! অনেকটা যেন আমার মতন মুখটা দেখতে হয়।

—তোমার মতন মূর্তি!

—হ্যাঁ, শিগগির চলে যা। বিলুর তো একটা ভ্যান আছে। সেই গাড়ির দিকে শুইয়ে, ঢাকাঢুকি দিয়ে নিয়ে আসবি, কেউ যেন দেখতে না পায়।

জোর করে আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললো, যা, যা, দেরি করিস না। এক্ষুনি চলে যা।

আমাকে যেতেই হলো।

এরপর একটার পর একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল।

বিলু আমার মাসতুতো দাদা। সে ভালো গাড়ি চালায়। তার একটা পুরোন ভ্যান আছে।

বিলুদা জানে, বিশ্বমামা সব সময় রহস্য করে কথা বলে। পরে যাতে বোঝা যায়। আমার কথা শুনে বললো চল, একটা মূর্তি কিনে আনি। তারপর দেখা যাক কী হয়।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সাতেক দেরি আছে বটে কিন্তু কুমোরটুলিতে এর মধ্যে অনেক মূর্তি গড়া হয়ে গেছে। একটু কাঁচা দেখে একটা মূর্তি নিয়ে আমরা কুমোরকে বললুম, নাক-চোখ খানিকটা পাল্টে দিতে।

সেই মূর্তি এনে রাখা হলো বিশ্বমামার ঘরে।

বিশ্বমামা বললেন, বা বেশ হয়েছে। এ যে ঠিক আমার মতন। তোরা এখন যা। আমাকে ডিসটার্ব করিস না। রাত্তিরে বারোটার সময় আমার ঘরে আসিস।

কাউকে কিছু বলবি না।

তারপর থেকে আর আমাদের সময় কাটে না। কখন সন্ধে হবে। কখন রাত্তির হবে?

ঠিক বারোটায় বিশ্বমামার ঘরে আসতেই তিনি বললেন, এসেছিস! এবার এক কাজ করা যাক। মূর্তিটা টেনে সামনের জানলার কাছে নিয়ে আয় তো।

আমরা সবাই ধরাধরি করে সেটাকে নিয়ে এলাম জানলার কাছে, মুখটা করা হলো রাস্তার দিকে, তারপর খুলে দেওয়া হলো জানলা। এবার মনে হলো বিশ্বমামাই যেন জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছেন।

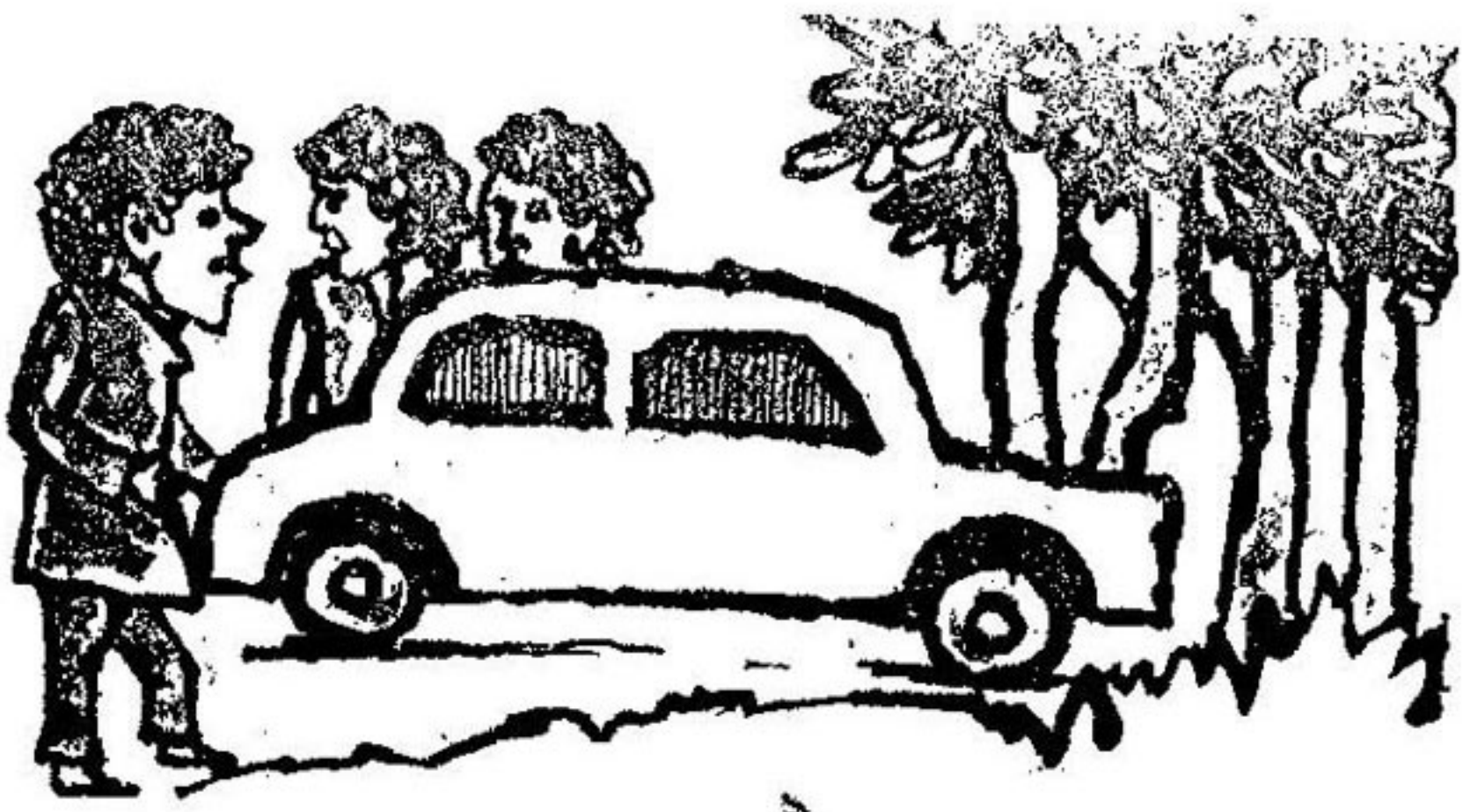
বিশ্বমামা বললেন, এবার সবাই খাটের নীচে শুয়ে পড়। শুয়ে পড়। একটা মজা দেখতে পাবি।

আমরা শুয়ে রইলাম খাটের নীচে। বিশ্বমামা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আছে। কথা বলাও বারণ। এক একটা মিনিট কাটছে এক ঘন্টার মতন।

খানিক বাদেই পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো।

মাটির মূর্তিটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল!

বিশ্বমামা বললেন, দেখলি, দেখলি ওরা আমায় খুন করতে চায় কিনা?



বিলুদা আর আমি এক সঙ্গে বলে উঠলাম, ওরা কারা? কে তোমায় খুন করতে চায়?

বিশ্বমামা বললেন, হাজারীবাগ! আমার এক্ষুনি হাজারীবাগ যাওয়া দরকার। রাস্তা এখন ক্লিয়ার। গুলি ছোঁড়ার পর ওরা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না বিলু, আজ রাত্তিরে তোর গাড়িতে আমায় হাজারীবাগ পৌঁছে দিতে পারবি।

আধঘন্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিশ্বমামা যখন যা চাইবে, তাতে দেরী করা চলবে না।

বিশ্বমামা নিজের গবেষণার কিছু যন্ত্রপাতি, জরুরি কাগজপত্র আর ক্যানাডার সেই পাথরগুলো গাড়িতে বোঝাই করলেন। হাজারীবাগে কত পাথর আছে, তবু এগুলো নিয়ে যাবার দরকার কী?

কিন্তু জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। উত্তর পাবো না।

গাড়ি চালাতে লাগলেন বিলুদা, তার পাশে আমি। পেছনে বিশ্বামামা।

বিশ্বমামা বারবার পেছনের দিকে তাকাতে লাগলেন। আমাকে বললেন, নীলু লক্ষ্য রাখবি। কেউ আমাদের ফলো করছে কিনা। সে রকম সন্দেহ হলেই রাস্তা পাল্টাতে হবে!

এত রাত্তিরে একেবারে ফাঁকা। গাড়ি বিশেষ নেই। কলকাতা ছাড়িয়ে আমরা দিল্লি রোড ধরলাম। কেউ আমাদের ফলো করছে বলে মনে হলো না।

বিলুদা এত জোরে গাড়ি চালালো যে তিন-চার ঘন্টার মধ্যে আমরা চলে গেলুম বহু দূরে।

তারপর একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ভোরের কিছুটা বাকি আছে। বিলুদা যদিও আমাকে ঘুমোতে বারণ করেছিল, তবু আমি ঢুলে ঢুলে পড়ছি মাঝে মাঝে!

হঠাৎ এক সময় গাড়ির গতি আস্তে হতে হতে একেবারেই থেমে গেল।

বিলুদা বলে উঠলো, সর্বনাশ!

পেছন থেকে বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

বিলুদা বললেন, ইস! দারুন ভুল করে ফেলেছি। পেট্রলের হিসেব করতে ভুল হয়ে গেছে। ভেবেছিলুম যা পেট্রল আছে তাতে ধানবাদ পর্যন্ত হয়ে যাবে।

ওখান থেকে আবার পেট্রল ভরে নেবো। এখন কী হবে? জঙ্গলের মধ্যে জেগে থাকতে হবে। সকাল না হলে তো কিছু করাও যাবে না।

আমি, ভয় পেয়ে গেলুম খুব। জঙ্গলের মধ্যে থেমে থাকবি—যদি ডাকাত আসে?

বিশ্বমামা অবশ্য বললো, নো প্রবলেম! দেখি কী করা যায়। তোরা নেমে পড়। একটু এগিয়ে দ্যাখ, কোনো গাড়িটাড়ি এসে পড়ে কিনা।

ভয়েই আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

বিশ্বমামা বললো, আর একটু দূরে যা। আমি কী করছি দেখবি না। ডাকলে



আসবি।

মিনিট দশেক বাদেই বিশ্বমামা ডাকলো, বিলু, নীলু, এদিকে আয়।

আমরা দৌড়ে এসে দেখি বিশ্বমামা কয়েকটি যন্ত্র রাস্তায় নামিয়ে কী সব করছিলেন, এখন সেগুলো আবার গাড়িতে তুললেন।

বিলুদাকে বললো দ্যাখ তো, গাড়ি এবার স্টার্ট নেয় কিনা?

বিলু বললো, তেল ছাড়া কী করে স্টার্ট নেবে?

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, দ্যাখ না!

বিলুদা উঠে চাবি লাগিয়ে ঘোরাতেই গাড়িটা জেগে উঠলো। বিলুদা দারুন অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বললো—একী? একী? তেল এলো কী করে?

গাড়ি স্টার্ট নিলোই শুধু না, দেখা যাচ্ছে যে তেলের কাঁটা খানিকটা ওপরে উঠে গেছে। গাড়িতে তেল ভরা হয়েছে! অথচ এক ফোটা তেল ছিল না।

বিলুদা বললো, বিশ্বমামা, গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গেল, এটা কি ম্যাজিক নাকি? তুমি তেল পেলে কোথায় বলতেই হবে।

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, পাথর।

আচ্ছা কোনো মানে হয়? এর কোনো মাথা মুন্ডু আছে? পেট্রল কোথায় পাওয়া গেল, তার উত্তর কি পাথর হতে পারে?

বিশ্বমামা চোখ বুজে ফেলেছেন। আর কিছু বলবেন না।

তিনদিন পরে বোঝা গেল, পাথরটাই উত্তর। ক্যানাডায় কেন অন্য বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বমামাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কেন বিশ্বমামা দেশের উপকার করার জন্য ফিরে এলেন, কেন কিছু লোক ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল, এমনকি গাড়িতে কী করে পেট্রোল এলো, এই সব কটা প্রশ্নের উত্তরই পাথর।

বিলুদা বিশ্বমামার ঘরের কিছু কাগজপত্র পড়ে নিজে বুঝেছে, আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ক্যানাডার অ্যাথাবাস্কা নদীর ধারে প্রচুর পাথর পড়ে থাকে সেগুলিকে সাধারণ বেলেপাথরের মতো দেখতে হলেও একটা দারুন বৈশিষ্ট্য আছে। ওগুলো আসলে হচ্ছে অয়েল স্যান্ড বা তৈল শিলা। পেট্রোলিয়ামই কোনো ভাবে এই সব পাথরের মধ্যে ঢুকে থাকে। এখন এই পাথর থেকে আবার পেট্রোলিয়াম

বের করতে পারলে পৃথিবীর তেলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের দেশে পেট্রোলের খুব অভাব, আমাদের খুব উপকার হবে।

কী করে ঐ সব পাথর থেকে সস্তায় পেট্রোল বার করা যায় তা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। সেই গবেষণায় বিশ্বমামা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আবার আরবের যে সব দেশে খুব সহজেই পেট্রোল পাওয়া যায়, তারা ভাবছে, পাথর থেকে পেট্রোল বার করতে পারলে তাদের পেট্রোলের দাম কমে যাবে। তাই তারা চাইছে এই গবেষণা বন্ধ করতে। তাদের কেউ খুন করতে চেষ্টা করেছিল বিশ্বমামাকে।

বিশ্বমামা পাথর থেকে তেল বার করার উপায়টা বার করে ফেলেছেন কিন্তু সেটাকে আরও সহজ করা দরকার। তাই নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন হাজারীবাগে বসে। খুব গোপনে। তাঁকে এখন একটুও ডিসটার্ব করা যাবে না।



বিশ্বমামার হায় হায়

এবার অনেক দিন পর দেশে ফিরছেন বিশ্বমামা। পাঁচ মাস তো হবেই! সাধারণত এত বেশিদিন তিনি বাইরে থাকেন না। পৃথিবীর নানা দেশে বক্তৃতা করতে যান, ফিরে আসেন এক-দেড় মাসের মধ্যে। অন্য দেশে বিশ্বমামা বেশিদিন থাকতে চান না, তার কারন বাঙালী রান্না ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাঁর পছন্দ হয় না। কুমড়ো আর কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি তো আর কোনো দেশে পাওয়া যাবে না। পটলের দোরমাই বা অন্য দেশে কে তাঁকে তৈরি করে দেবে? বিশ্বমামা মাংস খান না একেবারেই।

দমদম এয়ারপোর্টে আমরা কয়েকজন বিশ্বমামাকে আনতে গেছি। ওপরের ভিজিটার্স গ্যালারি থেকে দেখলাম, বিশাল বিমানটা আকাশ থেকে নেমে মাটি ছুঁলো। একটু বাদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো যাত্রীরা। কিন্তু বিশ্বমামা কই? কয়েক শো লোক নামলো, তবু বিশ্বমামাকে দেখা যাচ্ছে না।

সবাই নেমে যাবার পর সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল একজন লম্বা লোককে।

আমার মাসতুতো দাদা বিলু বললো, ঐ দ্যাখ নাকেশ্বর ধপধপে!

বিশ্বমামার আড়ালে আমরা তাঁকে ঐ নামে ডাকি। তাঁর সারা শরীরের মধ্যে নাকটাই প্রথম দেখা যায়। এতবড় নাক-ওয়ালা মানুষ বোধহয় আর কেউ দেখেনি। আর ওঁর গায়ের রংটা সাহেবদের মতন।

অন্য যাত্রীদের কাঁধে ঝোলানো মোটা সোটা ব্যাগ, হাতে কত রকম জিনিস-পত্র আর বিশ্বমামার সঙ্গে কিছুই প্রায় নেই। শুধু এক হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট। নাকি একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স? দশ টাকার সন্দেশ কিনলে যে-রকম বাক্স দেয়, সেই রকম।

সেই বাক্সটাকে উঁচু করে ধরে খুব সাবধানে আসছেন বিশ্বমামা।

অন্যান্যবারে বিদেশ থেকে তিনি আমাদের জন্য নানা রকম চকলেট নিয়ে আসেন আর বড় বড় প্যাকেট ভর্তি ক্যান্ডি। এবার সে সব কিচ্ছু নেই? অন্য কোনো খাবার এনেছেন? ঐটুকু বাক্সে কী আর খাবার থাকতে পারে?

কাস্টমসের জায়গা পার হতে বিশ্বমামার অনেকটা সময় লাগবে। আমরা

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বমামা একটা ট্রলিতে সুটকেস নিয়ে বেরুলেন, এক হাতে সেই প্যাকেটটা উঁচু করে ধরা।

আমাদের দেখে বিশ্বমামা এক গাল হেসে বললেন, কীরে, নীলু, বিলু, পিলু তোরা সব কেমন আছিস?

বিলুদা সুটকেসটা তুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে রাখলো। আমাদের দিকে একবার চোখ টিপে মাথা নাড়লো। অর্থাৎ সুটকেশটা বিশেষ ভারী নয়। এর আগে একবার ক্যানাডা থেকে বিশ্বমামা এক সুটকেশ ভর্তি পাথর এনেছিলেন। সেই সুটকেস বইতে বিলুদার জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল।

আমার তক্ষুণি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল যে বিশ্বমামা হাতের ঐ প্যাকেটটায় কী আছে। কিন্তু মা বলে দিয়েছিল, হ্যাংলামি করবি না। বিশ্বকে দেখেই চকলেট চাইবি না। তোরা বড় হয়েছিস, এখন একটু ভদ্রতা সভ্যতা শেখ।

ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বাড়ি পৌঁছোনো পর্যন্ত।

কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করতেই পিলু ফস করে বলে উঠলো, বিশ্বমামা, তোমার হাতের ঐ বাক্সটায় কী আছে?

পিলু এখনও অনেক ছোট, ওর এখনো ভদ্রতা মানবার বয়েস হয় নি।

বিশ্বমামা বললেন, আগে বল তো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ফসিলের কী সম্পর্ক?

পিলুর মুখ শুকিয়ে গেল, আমি তাকালাম জানলার বাইরে।

বিশ্বামামার স্বভাবই এই, কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবেন না। তার বদলে উল্টে অন্য একটা প্রশ্ন করে বসবেন। বিদঘুটে প্রশ্ন। হ্যাঁ, বিদঘুটেই তো। ফসিল কাকে বলে তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

বিলুদা জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বমামা, তুমি তো এবারে সাহারা মরুভূমিতে ঘুরে আসবে বলেছিলে?

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের কাছাকাছি এই পশ্চিম বাংলার মধ্যে কী কী জঙ্গল আছে রে?

এ প্রশ্নের উত্তরও গেল।

আমি বললুম সবচেয়ে কাছে সুন্দরবন।

বিশ্বমামা বললেন, না, ওটা চলবে না। ওপারে অনেক মানুষ থাকে। আর?

আমি বললুম, মেদিনীপুরে আছে কাঁকড়াঝোড়। উত্তরবঙ্গে অনেকগুলি জঙ্গল আছে। চাপড়ামারি, গোরুমারা, হলং।

বিশ্বমামা বললো, হ্যাঁরে বিলু, তোর পিসেমশাই বেঁচে আছেন?

বিলু বললো, না, তিনি স্বর্গে গেছেন।

বিশ্বমামা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাড়িটায় এখন কে থাকে?

বিলু বললো, সেটা এখন এমনিই খালি পড়ে আছে। অনেকে বলে ঐ বাড়িতে নাকি ভূত আছে।

বিশ্বমামা বললেন, গুড। ঐ রকমই চাইছিলাম। চল, ওখানে যাব।

বিলু বললো, এক্ষুণি?

বিশ্বমামা বললো, না, এক্ষুণি তো যাওয়া যাবে না। আজকের দিনটা বাড়িতে থেকে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

একথা শুনে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। কলকাতায় বেশি দিন থাকতে আমার ভালো লাগে না। কাল বাইরে যাওয়া হবে, একটা কিছু অ্যাডভেঞ্চার হবে

বিলুদার পিসেমশাই ছিলেন পাগলাটে ধরনের মানুষ। ওঁর স্ত্রী মারা যাবার পর উনি বর্ধমানের জঙ্গল মহলে কী সব নাকি তন্ত্র সাধনা করতেন। একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি, কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই। তবে ঐ বাড়িতে নাকি ভূত ছিল।

বিশ্বমামা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছেড়ে হঠাৎ ভূত ধরতে চান নাকি? বিদেশ থেকে এসেই অমনি যেতে চান জঙ্গলে।

বাড়িতে এসে বিশ্বমামা প্রথমেই তার হাতের প্যাকেটটা সাবধানে রাখলেন আলমারির মাথায়।

তাঁর সুটকেসের মধ্যে আমাদের জন্য কিছু টফি আর ক্যান্ডি এনেছেন বটে। বেশি না।

ছোট্ট প্যাকেটটায় কী আছে তা যে জিজ্ঞেস করে তাকেই বিশ্বমামা হেসে

বলেন, মনে করো ঘোড়ার ডিম!

পরদিন ভোরবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্বমামা অনেক কী যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিলেন। পৌঁছতে লাগলো তিন ঘন্টা। বর্ধমানের এই জঙ্গলটা তত বড় নয়, কিন্তু এক এক জায়গায় খুব নিবিড়। বিলুদার পিসেমশাইয়ের বাড়িটা প্রায় বাহা চুড়ো অবস্থায় পড়ে আছে। সব ঘরগুলো ধুলো ভর্তি। আমরা তালা খুলে খুলে ঢুকতে লাগলুম। এই রকম খালি-ফেলে-রাখা বাড়ির দরজা-জানালাও খুলে নিয়ে যায় চোরেরা। কিন্তু ভূতের ভয়েই বোধহয় চোরেরা এদিকে আসে না।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ। কাছাকাছি অনেক গাছ আছে, তাতেই আমার সুবিধে হবে!

দুটো ঘর সাফ করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাল ডাল আরও সব রান্নার জিনিসপত্র সঙ্গে আনা হয়েছে। বিলুদা রান্না করতে পারে। আর আনা হয়েছে কয়েকটা কাঁচা আম। কাঁচা আম পাতলা করে কেটে নুন দিয়ে খেতে খুব ভালোবাসেন বিশ্বমামা।

সেই রকম এক প্লেট কাঁচা আম কেটে সাজিয়ে নিয়ে বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, বিশ্বমামা, এবার দয়া করে বলবে, তোমার ঐ প্যাকেটটাতে কী আছে?

বিশ্বমামা বললেন, ভূতেরা এখানে থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। ভূতেদের দাঁত থাকে না, তারা কামড়াতে পারবে না। ভূতেরা সব নিরামিষাশী।

বিলুদা বললো, কথা ঘোরাতে পারবে না। আমরা কেউ ভূত-টুত মানিনা। তুমিও ভূত ধরতে আসোনি তা জানি। ওটাতে কী আছে আমাদের বলতেই হবে।

—কেন, ঘোড়ার ডিমটা বুঝি পচ্ছন্দ হলো না?

—আমাদের কি ছেলেমানুষ পেয়েছো, বিশ্বমামা?

—তোরা কেউ ক্যামেরা এনেছিস?

—আবার কথা ঘোরাচ্ছো, ঘোড়ার আবার ডিম হয় নাকি?

—হয় না। তাই না? সেই জন্যই 'কিচ্ছু নেই' বোঝাতে বাংলায় বলে ঘোড়ার ডিম! আচ্ছা, হাতির ডিম হয়?

—সবাই জানে হাতির বাচ্চা হয়!

—বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, হাতি এদের কারুরই ডিম হয় না।

এবার আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য—কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম হয় না, বাচ্চা জন্মায়—বললুম।

বিশ্বমামা বললেন, আমি যদি বলি, হাতির চেয়েও বড় কোনো প্রাণীর বাচ্চা হয় না। ডিম হয়?

আমি মাথা চুলকে বললুম, হাতির চেয়ে বড় প্রাণী? তা হলে কী তিমি মাছ?

বিশ্বমামা বললেন, বাগানে চল। আমার যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে নে।

বিলুদা বললো, সেগুলো গাড়িতে আছে। নামানো হয়নি।

সবাই গেলাম গাড়ির কাছে। সেখান থেকে নামানো হল অনেক জিনিসপত্র। একটা বেশ বড় ধরনের কাচের বাক্স দু'হাতে তুলে বিশ্বমামা বললেন, এটা আমার বিশেষ আবিষ্কার, জানিস তো?

একটা কাচের বাক্সকে আবার আবিষ্কার করার কী আছে কে জানে! সেটাকে নিয়ে বিশ্বমামা বাগানের এক জায়গায় বসলেন। বাক্সটার সঙ্গে জুড়ে দিলেন কয়েকটা মোটর, আরও সব কী যেন।

সেই কাচের বাক্সটার একটা দরজা আছে। সেটাকে খুলে বিশ্বামামা রাখলেন তার সেই বহু মূল্যবান প্যাকেটটা।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে আমি গোবি আর সাহারা মরুভূমিতে কতকগুলি ফসিল দেখতে গিয়েছিলাম জানিস তো।

তারপর পিলুর দিকে ফিরে বললেন, 'বরাসপোরাস টাগোরোই' কী—জানিস না? এক ধরনের ফসিল। ডাইনেসরের ফসিল। এটা পাওয়া গিয়েছিল গোদাবরী নদীর কাছে। ডাইনেসররা যেমন অতিকায় প্রাণী, সেরকম লেখক-কবিদের মধ্যে অতিকায় মানে সবচেয়ে বড় কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরিজিতে বলে রবীন্দ্রনাথ টেগোর, তার থেকে টাগোরাই! রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে ঐ ডাইনেসরের ফসিলের নাম রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামে।

এবার বিশ্বমামা খুব সাবধানে প্যাকেটটা খুললেন। আমরা হুমড়ি খেয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখে কিছুই বোঝা গেল না। অনেকটা লম্বাটে চমচমের মতন একটা জিনিস। শক্তিগড়ের ল্যাংচার মতন। কিন্তু সেটা যে খাবার জিনিস

নয়, তা নিশ্চিত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী?

বিশ্বমামা বললেন, এখনো বুঝলি না, নীলু? এটা একটা ডিম।

ডিম? যাঃ কী বলছো। ডিম কখনো লম্বা হয়?

কেন হবে না? এটা যে প্রাণীর ডিম, সেটাও যে খুব লম্বা!

কোন্ প্রাণীর ডিম?

গোবি মরুভূমিতে ডায়নেসরের ফসিল, অর্থাৎ জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। সেটা দেখে বোঝা গিয়েছিল ওদের ডিম কেমন হয়। তারপর হঠাৎ এবার সুইজারল্যান্ডে ম্যাটারহর্ণ পাহাড়ের বরফের মধ্যে এই ডিমটা আমি আবিষ্কার করেছি! বরফের অনেক নীচে ছিল, তাই এটা নষ্ট হয়নি। খুব সম্ভবত এটা ফুটিয়ে বাচ্চা বের করা যেতে পারে। এই কাচের বাক্সটা হচ্ছে একটা নতুন ধরনের ইনকিউবেটর। এটার মধ্যে থাকলে শুধু যে ডিম ফোটানো যাবে তাই-ই না, বাচ্চাটাকে অনেক তাড়াতাড়ি বড় করা যাবে।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, এটা থেকে ডায়নেসর জন্মাবে? ওরে সর্বনাশ!

বিশ্বমামা বললেন, ভয়ের কী আছে? ডায়নেসর আসলে কী বলতো? খুব বড় সাইজের টিকটিকি! একটা টিকটিকিকে এক হাজার গুণ বড় করে মনে মনে ভাব! টিকটিকি কি মানুষকে কামড়ায়? বেশির ভাগ ডায়নেসরই ঘাস পাতা এই সব নিরামিষ খেত। যে সব জন্তু নিরামিষ খায়, তারা চট করে মানুষকে কামড়ায় না! হাতির কথা ধর, হাতি মানুষকে কক্ষণো কামড়ায় না। মানুষ বেশি বিরক্ত করলে হাতি তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে।

আমি বললাম, এখনকার পৃথিবীতে একটা বিরাট ডায়নেসর জন্মাবে, তা কি সম্ভব?

বিশ্বমামা বলল, সম্ভব কি অসম্ভব তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

বিশ্বমামা একবার ইনকিউবেটরটা চালু করে দিলেন। তারপর অবিশ্বাস্য সব কান্ড ঘটতে লাগল।

দশ মিনিট বাদেই ফট করে ডিমটা ফেটে গেল। ফাটার শব্দ হলো

রীতিমতন। আমরা ঝুঁকে দেখলুম, তার মধ্যে কী একটা কিলবিল করছে।

বিশ্বমামা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন, বেঁচে আছে, বেঁচে আছে!

আধ ঘন্টার মধ্যেই সেই জিনিসটা মাথা তুললো। ঠিক টিকটিকির মতনই মাথা।

আরও আধঘন্টার মধ্যে সেটা আর একটু বড় হতে টিকটিকির বদলে মনে হলো গিরগিটি!

বিশ্বমামা ফিসফিস করে বললেন, ব্রনটোসরাস। এরা খুব নিরীহ! সারা পৃথিবী চমকে যাবে। এটার জন্য হাওড়া স্টেশনের সাইজের একটা খাঁচা বানাতে হবে।

বিলুদা বললেন, দ্যাখ না কী হয়!



সেই গিরগিটিটা ক্রমশ বড় হতে লাগলো। পিঠের দিকটা উঁচু হয়ে গেল আর ল্যাজটা লম্বা হলো অনেকখানি।

এক সময় সে প্রাণীটার মাথা ঠেকে গেল কাঁচের বাক্সটার ভেতরে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওকি আরও বড় হবে? ওর মধ্যে কী করে বড় হবে?

বিশ্বামামা বললেন, ব্রনটোসরাস কাঁচের বাক্সটা ফাটিয়ে ফেলবে!

পিলু ভয় পেয়ে বললো, ওরে বাবা, আমি পালাচ্ছি!

এরপরই অদ্ভুত একটা ব্যাপার হতে লাগলো। সেই প্রাণীটা আরও বড় হওয়ার বদলে ছট ফট করতে লাগলো কাঁচের বাক্সের মধ্যে। যেন ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। গায়ে যেন কিছু ফুটছে। যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিল কয়েকবার।

বিশ্বমামা ইনকিউবেটরের ইলেকট্রনিক চার্জ বন্ধ করে দিলেন।

প্রাণীটা তবু গড়াগড়ি দিতে দিতে কুঁকড়ে যেতে লাগলো।

পিলু বললো, ছোট হয়ে যাচ্ছে। আবার ছোট হয়ে গেল!

সত্যিই তাই! কুঁকড়ে-মুঁকড়ে ছোট হতে হতে সেটা আমার একটা টিকটিকির মতন হয়ে গেল।

বিশ্বমামা হতাশ ভাবে বললেন, বিবর্তনবাদ! বিবর্তনবাদ! এখনকার পৃথিবীতে আর ডায়নেসর জন্মাতে পারবে না! সব ডায়নেসর টিকটিকি হয়ে গেছে।

আমরা এত অবাক হয়ে গেছি যে কেউ আর কথা বলতে পারছি না।

বিশ্বমামা আবার আর্তনাদ করে বললেন, ক্যামেরা আনলি না? ছবি তুলে রাখলি না? অনেকটা বড় হয়েছিল। সবাইকে ছবি তুলে দেখাতাম! হায়, হায় হায়!

ক্যামেরা ছিল বিলুদার গাড়িতে। কিন্তু আমার সেকথা মনেই পড়ে নি। সত্যি একটা টিকটিকির মতন প্রাণী বড় হতে হতে ডায়নেসরের মতন চেহারা নিচ্ছিল। কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে?

ছবি তোলা হলো না বলে বিশ্বমামা মাথা চাপড়ে হায় হায় করতে লাগলেন!

বিশ্বমামার আবিষ্কার

রানীগঞ্জ স্টেশনে নেমে আরও সতেরো মাইল দূর বিশ্বমামার মামার বাড়ি। জিপ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। একটা জিপ গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আসলে স্টেশনের বাইরে ছিল চার পাঁচখানা জিপ গাড়ী। সেখান থেকে একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে বিশ্বমামার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললো, আসুন স্যার!

ড্রাইভারটিকে বিশ্বমামা আগে দেখেন নি। সেও বিশ্বমামাকে কখনো দেখে নি। তবু সে এত লোকের ভিড়ে বিশ্বমামাকে চিনলো কী করে?

ড্রাইভারকে সে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, এ তো স্যার খুব সোজা! বউদি বলে দিয়েছেন, দেখবে একজন লম্বা মতন লোক, গায়ের রং খুব ফর্সা, আর নাকটা গন্ডারের শিং-এর মতন। আর সঙ্গে থাকবে দুটি বাচ্চা ছেলে!

বিলুদা বললেন, গন্ডারের মতন নাক? ভাগ্যিস উনি বলেন নি হাতির শুঁড়ের মতন!

বিশ্বমামা নিজের লম্বা, চোখা নাকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, গন্ডারের শিং-এর মতন নাম তো খারাপ কিছু নয়! আর তোদের যে বাচ্চা ছেলে বললেন।

বিলুদা বললেন, একটু ভুল বলেছে। আমি বাচ্চা নই, নীলু বাচ্চা! ড্রাইভারটির নাম বাস্তা সোরেন। সে সাঁওতাল হলেও বাংলা বলে জলের মতন। ইংরিজিও খানিকটা জানে। বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস হবে। বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে জিপ গাড়িটা যেতে লাগলো একটি সরু রাস্তা দিয়ে। সরু তো বটেই, তাছাড়াও রাস্তার অবস্থা ভালো না, এবড়ো-খেবড়ো, মাঝে-মাঝে বড় বড় খানা-খন্দ। এখনো এখানে-সেখানে জল জমে আছে। আমরা চলেছি লাফাতে লাফাতে। তাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বেড়াতে বেরুনোটাই আনন্দের ব্যাপার।

একটু পরেই রাস্তাটা ঢুকে গেল একটা জঙ্গলের মধ্যে। কত রকম গাছ। আমি কিংবা বিলুদা অতশত গাছ চিনি না। বিশ্বমামা আমাদের গাছ চেনাতে লাগলেন। শাল, মহুয়া, জারুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আরও কত কী। অনেক গাছে ফুল ফুটে আছে। আমরা অনেক গল্পে এই সব গাছের নাম পড়ি। কিন্তু জারুলের সঙ্গে শিমুলের কী তফাৎ তা জানি না।

বিশ্বমামা বললেন, জানিস তো এর মধ্যে অনেক গাছই আমাদের দেশের নয়। বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এই দ্যাখ না। এই যে কৃষ্ণচূড়া। কী সুন্দর নাম। এই গাছ আনা হয়েছে ম্যাডাগাসকার থেকে। এখন আমাদের দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বমামা যে গাছটাকে কৃষ্ণচূড়া বলে দেখালেন, বাস্তা সোরেন সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটা তো গুলমোহর।

বিশ্বমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, আই নীলু, বল তো গুল মানে কী?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

বিশ্বমামা বললেন, তোরা কথায় কথায় এত গুল মারিস, আর গুল কথাটার মানেই জানিস না? বিলু তুই জানিস?

বিলুদার অবস্থাও আমার মতন।

বিশ্বমামা বললেন, গুল মানে ফুল। বাস্তা যে বললো গুলমোহর, সেটা ঠিক নয়। আমরা যে ফুলকে বলি কৃষ্ণচূড়া, হিন্দীতে তাকেই বলে গুলমোর। মোহর নয় মোর। মোর মানে ময়ূর। ময়ূরের পাখার মতন ফুল। রংটা না মিললেও ফুলটা দেখতে অনেকটা ময়ূরের পালকের শেষ দিকটার মতন। কৃষ্ণের মাথায় একটি ময়ূরের পালক থাকে, তাই বাংলায় বলি কৃষ্ণচূড়া আর হিন্দীতে গুলমোর।

মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাস্তা, তোমরা পলাশকে কী বলো?

বাস্তা একটু চিন্তা করে বললেন, আমি তো পলাশই বলি, ইংরেজিতে বলে ফ্লেইম অফ দা ফরেস্ট!

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক বলেছো তো! যখন এক সঙ্গে অনেক পলাশ ফুল ফোটে, তখন সমস্ত জঙ্গল যেন জ্বলতে থাকে। বাংলায় কিন্তু পলাশের আর একটা নাম আছে। নীলু আর বিলু, যদি সেই নামটা বলতে পারিস ফিরে গিয়ে তোদের একদিন চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়াবো।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বাস্তা জিজ্ঞেস করলো, কী নাম? বাংলায় অন্য কী নাম আছে?

বিশ্বমামা বললেন, কিংশুক। সংস্কৃত কথা। কোথায় পলাশ আর কোথায় কিংশুক। এই কিংশুক নামটা কিন্তু খুব মজার। চেনা-জানা আর কোনো ফুলের এরকম নাম নেই।

গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে প্রচন্ড জোরে লাফিয়ে উঠলো। সামনের সিটে ঠুকে গেল বিলুদার কপাল।

বাস্তা বললো, আর বেশি দেরি নেই। ঐ তো কারখানার চিমনি দেখা যাচ্ছে।

হাত দিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, কিংশুক নামটা কেন মজার?

বিশ্বমামা বললেন, এটা নামই নয়, এটা একটা প্রশ্ন। কিম শুক? কিছু বুঝলি?

বিলুদা বললেন, কী করে বুঝবো, আমি কি সংস্কৃত পড়েছি নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, সংস্কৃত পড়ার দরকার নেই। মাঝে মাঝে বাংলা অভিধান দেখলেই এসব জানা যায়। শুক মানে জানিস তো?

আমি বলে উঠলাম, 'আমি জানি, আমি জানি, এক রকম পাখি'!

বিশ্বমামা বললেন, কী পাখি?

আমি বললাম, গল্পের বইতে শুক আর সারি এই দুটো পাখির নাম পড়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, গল্পের বইয়ের কথা ছাড়। আমরা যাকে টিয়া পাখি বলি, আগেকার দিনে তাকেই বলা হতো শুক পাখি। এখন পলাশ ফুলের ডগার দিকটা লক্ষ্য করে দেখবি, অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতন। তাই এক সময় কোনো এক কবি মনে মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিম শুক? সত্যিই কি শুক বা টিয়া পাখির

মতন? সেই থেকে কিংশুক নাম হয়ে গেছে।

বাস্তা জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনি বুঝি বোটানি পড়েছেন?

বিশ্বমামা বললেন, কখনো না। আমি ডিকশনারি পড়ি।

একটু পরেই আমরা পৌঁছে গেলাম বিশ্বমামার মামার বাড়ি—আমার মায়েরও মামা বাড়ি। সুতরাং আমাদের দাদুর বাড়ি। কিন্তু এই দাদুকে আমরা কখনো দেখিনি।

দাদুর নাম জগদীশ, বিশ্বমামা তাকে ডাকেন জগুমামা বলে। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, বুড়ো বলে মনে হয় না। তিনি এখানে একটা ছোটখাটো কারখানা তৈরি করেছেন, এখানেই থাকেন, শহরে বিশেষ যান না। তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বমামা বলেন নতুন মামী। সুতরাং আমাদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন নতুন দিদিমা।

কী যত্নই যে করতে লাগলেন তিনি। সব সময় আমাদের নতুন নতুন কী খাওয়াবেন সেই চিন্তা। বিশ্বমামা উৎসাহের সঙ্গে বলেন, নতুন মামী, আরও খাওয়াও, তোমাদের এখানে খেতেই তো এসেছি!

কারখানাটা একটু দূরে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে জগুদাদুর বাংলো। অনেকগুলো ঘর, সামনে বাগান, পেছনে একটি পুকুর। হাঁস, মুর্গি, গরু আছে নিজস্ব।

বাস্তা সোরেনকে আমরা প্রথমে ড্রাইভার ভেবেছিলাম, পরে বুঝলাম সে এখানকার প্রায় ম্যানেজারের মতন। জগুদাদুর ডান হাত বলা যায়। এই বাস্তাদা জিপ গাড়ি নিয়ে সকাল বিকেল আমাদের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে আনে! বাস্তাদার বাড়িও কাছেই। বাস্তাদার একটি সাত-আট বছরের ছেলে আছে, তার নাম জাম্বো তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব জমে গেল।

এই জাম্বোই এই গল্পের নায়ক।

জাম্বো কথা খুব কম বলে, খেলতে ভালোবাসে। প্রত্যেকদিন সকালে ওর সঙ্গে আমরা ফুটবল খেলি, একটা রবারের বল নিয়ে। সেই বলটা নিয়েই আবার ক্রিকেটও খেলা হয়। অন্য বল নেই।

জাম্বো আবার নিজে ছবি আঁকে। ওদের বাড়ির সামনে একটা সিমেন্ট বাঁধানো চাতাল আছে। সেই চাতালের ওপর খড়ি দিয়ে আঁকে বড় বড় ছবি।

ওর আঁকার হাত আছে, শেখালে ও একদিন ভালো শিল্পী হতে পারবে।

জাম্বো সাধারণ ছবি আঁকে না। ঘোড়া এঁকে দুটো ডানা জুড়ে দিয়ে বলে পক্ষীরাজ। মানুষ এঁকে তার মস্তবড় কুলোর মতন কান জুড়ে দিয়ে বলে অন্য গ্রহের মানুষ। জাম্বোর যখন ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়, তখন সে খেলতেও চায় না।

আমাদের সঙ্গে জাম্বো মাঝে মাঝে বেড়াতে যায়। আবার এক একসময় যায় না, তখন ছবি আঁকে।

একদিন আমরা একটা পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে বাস্তাদের বাড়িতে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি চা খাওয়ার জন্য। জাম্বো ছবি আঁকছে চাতালে।

বারান্দায় ডান দিকে একটা মস্ত বড় উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ওটা সব সময় জ্বলে। নেভাতে দেখিনি কখনো। ঐ উনুনে চায়ের জন্য জল চাপানো হয়েছে।

বিলুদা বললো, বাস্তাদা, তোমাদের এখানে কয়লা খুব শস্তা, তাই তোমরা সব সময় উনুন জ্বালিয়ে রাখো। দেশলাই কাঠির খরচ বাঁচাও!

বাস্তাদা হেসে বললো, শস্তা মানে কী, আমাদের সব কয়লা তো বিনা পয়সায় বলতে গেলে!

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, বিনা পয়সার কেন? কাছাকাছি অনেক কয়লার খনি আছে? কেউ বুঝি তোমাদের বিনা পয়সায় কয়লা দেয়?

বাস্তাদা বললো, অন্য কেউ দেবে কেন? আমাদের নিজেদেরি তো কয়লার খনি আছে।

বিশ্বমামা বললেন, জগুমামার কয়লাখনি আছে শুনিনি তো! কোথায় সেটা?

বাস্তাদা বললো, সে মজার ব্যাপার শোনেন নি? আপনার জগু মামা গত বছর ওঁর বাংলোর পেছনে একটা পুকুর খোঁড়াচ্ছিলেন। এখানে তো শক্ত পাথুরে মাটি, পুকুর খোঁড়া সহজ নয়। চার ফুট খুঁড়তে না খুঁড়তে ঠং ঠং করতে লাগলো। কোদাল, গাঁইতি চালিয়ে মজুররা ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল তলা

থেকে মাটির বদলে বেরুচ্ছে কয়লা। বেশ ভালো জাতের কয়লা। সরাসরি উনুনে এনে জ্বালানো যায়। পুকুরের বদলে আমরা পেয়ে গেলাম একটা কয়লার খনি!

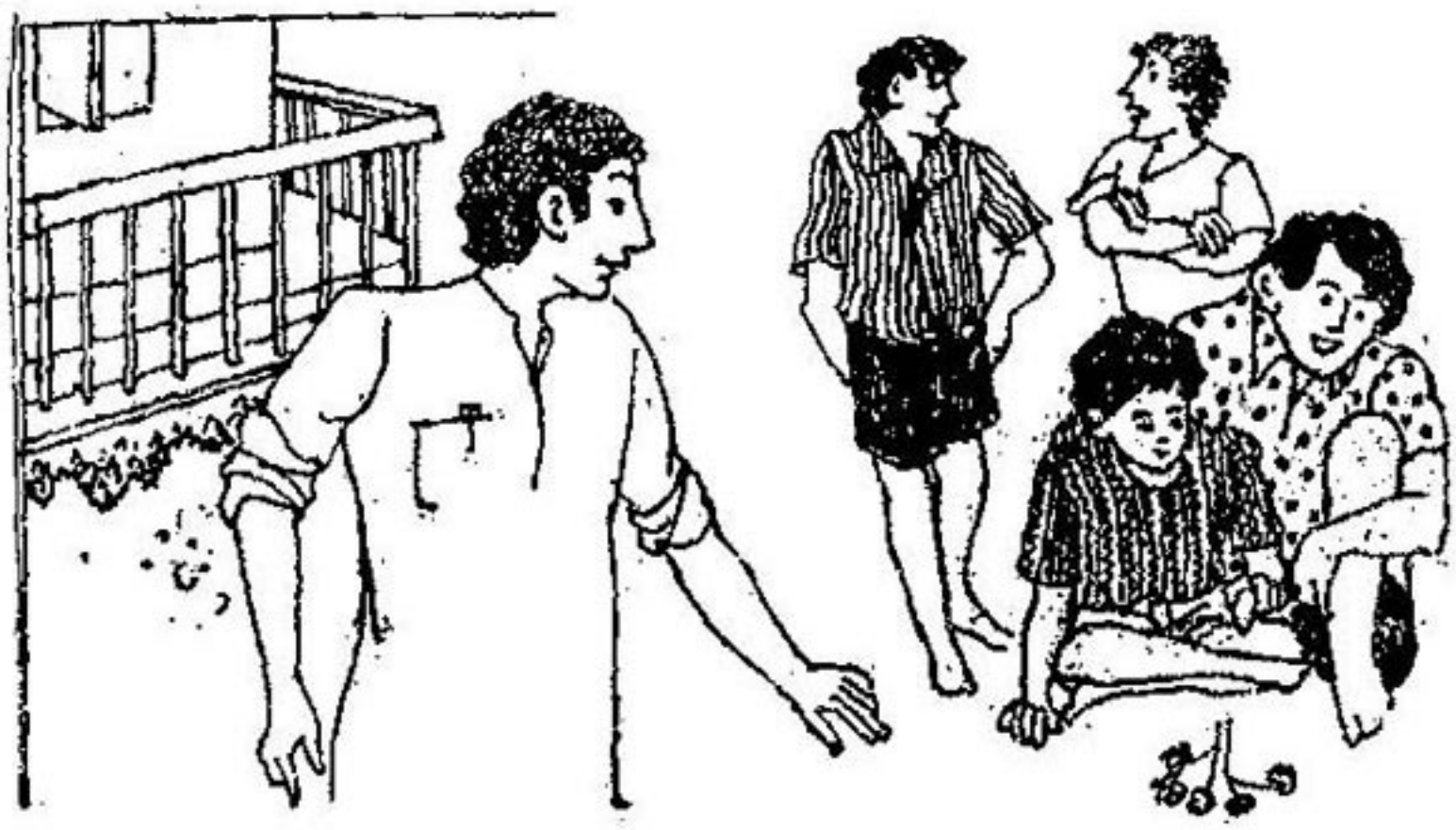
বিশ্বমামা বললেন, সত্যিই তো মজার ব্যাপার! কিন্তু এখন কয়লাখনি সব গভর্ণমেন্ট নিয়ে নেয় না?

বাস্তাদা বললো, সরকারের লোকদের জানানো হয়েছে। আপনার জগু মামা কখনো বে-আইনি কাজ করবেন না। সরকারি লোক এসে পরীক্ষা করে দেখে বলেছে, কয়লা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু জায়গাটা বেশি বড় নয়। ঐ পুকুরের মাঝেই ঐ টুকু জায়গাতে কী করে যেন কয়লা জমে আছে। এইটুকু কয়লা খনি সরকার নিতে চায় না। আমরাই ব্যবহার করতে পারি। ঐ কয়লাতে আমাদের আরও তিন চার বছর চলে যাবে।

বিলুদা বললো, তাই দেখছি ঐ পুকুরটায় কী রকম কালো কালো নোংরা জল।

বাস্তাদা বললেন, একটুখানি মোটে জল আছে। পাম্প করে তোলা যায়। তারপর আমরা দরকার মতন কয়লা কেটে নিই।

এরপর চা খেতে খেতে আমরা কয়লার গল্প ছেড়ে অন্য গল্প করতে লাগলাম।



এক সময় বিশ্বমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখি তো, আমাদের জাম্বো সাহেব কী ছবি আঁকছে।

আমরাও দেখতে গেলাম।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে জাম্বো খড়ির বদলে একটা খসখসে পাথরের মতন জিনিস দিয়ে বড় করে কী যেন আঁকছে।

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, আজ কিসের ছবি আঁকা হচ্ছে জাম্বো?

জাম্বো গম্ভীর ভাবে বললো, এটা একটা গাছ। আর এই যে ফুলগুলো দেখছো, এগুলো সব এক একটা হীরে।

আমি বললাম, সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা ফ্যাক করে হেসে বললো, গাছে হীরে ফলেছে। তাও এক একটা হীরে তালের মতন বড়।

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, হাসছিস যে! গাছে কি হীরে ফলে না?

বিলুদা ইয়ার্কি করে বললো, ফলে বুঝি? তুমি দেখেছো? কোথায়, কামস্টাটকা না ম্যাডাগাস্কার?

বিশ্বমামা জাম্বোর হাতের পাথরটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ওটা একবার দেখি তো জাম্বো।

সেটা হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, মেঝেতে দাগ কাটতে লাগলেন। অনেকটা শ্লেট পেন্সিলের মতন দাগ পড়লো।

বিলুদা বললো, ওটাও হীরে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, না, এটা গ্র্যাফাইট। কাকে গ্র্যাফাইট বলে জানিস?

তারপরেই লাফিয়ে উঠে বললেন, এক্ষুণি জগু মামার সঙ্গে কথা বলা দরকার!

দৌড়াতে দৌড়াতে বাংলোতে গিয়ে বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, জগুমামা, তোমাকে একটা অনুরোধ করবো? কালকেই অনেকগুলো মজুর লাগিয়ে তোমার পুকুরের সব কয়লা কাটিয়ে ফেলতে পারবে? কয়লা ওপরে জমা করে রাখলেও তো নষ্ট হয় না।

জগু দাদু বললেন, কেন, সব কয়লা একসঙ্গে কাটাতে হবে কেন?

বিশ্বমামা বললেন, আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবো।

জগুমামা আপত্তি করলেন না। বিশ্বমামা নাম করা বৈজ্ঞানিক। তিনি নিতান্ত বাজে কথা বলবেন না। যখন সব কয়লা তুলে ফেলতে বলছেন, নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু মুস্কিল হল, বিশ্বমামা কিছুতেই তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলবেন না। আমাদের কাছে বারবার বলতে লাগলেন, গাছে হীরে ফলে না! সোনার গাছে হীরের ফুল!

বিলুদা বললো, কয়লা সব শেষ হলে তারপর বুঝি হীরের খনি বেরুবে?

বাস্তাদা বললো, এদিকে এত খনি আছে রাণিগঞ্জ, ঝরিয়া, আসানসোল, কোনো খনিতে কখনো হীরে বেরিয়েছে বলে শুনিনি!

পরদনিই পঞ্চাশ জন মজুর কাজে লেগে গেল। বিশ্বমামা নিজে তদারকি করতে লাগলেন কাজের। সব সময় ওদের মধ্যে লেগে রইলেন। নিজে হাত লাগান মাঝে মাঝে। ওঁর জামা কাপড়ে সব কয়লার গুঁড়ো লেগে একেবারে কালো ভূত হয়ে গেলেন।

তারদিন পর দেখা গেল কয়লার স্তর খুব গভীরে নয়। তলায় পাওয়া যাচ্ছে নরম মাটি। সব কয়লা তুলে ফেলার পর সেই নরম মাটি ফুঁড়ে পরিষ্কার জল বেরতে লাগলো। এবার সেটা সত্যিকারের একটা পুকুর হয়ে গেল।

আমি আর বিলুদা বিশ্বামামাকে চেপে ধরে বললুম, কোথায় গেল তোমার সোনার গাছ আর হীরের ফুল?

বিশ্বমামা মুচকি হেসে বললেন, আমার জগুমামা একটা পুকুর কাটাতে গিয়ে কয়লা দেখে থেমে গিয়েছিল। আমি কয়লা সব তুলিয়ে পুকুরটা পুরো করে দিলুম। কয়লাও পাওয়া গেল। পুকুরও পাওয়া গেল, ব্যাস!

জগুদাদু বললেন, আমি তাতেই খুশি। বেশ করেছিস বিশ্ব। একটা পুকুরের বড় দরকার ছিল। তাতে মাছ চাষ করবো। পরের বার এলে তোদের পুকুরের

মাছ খাওয়াবো।

বিশ্বমামা বললেন, দাঁড়াও জগুমামা, এই বিলু আর নীলু গবেট দুটোকে একটা জিনিস দেখাই। গাছে হীরে ফলে না! তবে এটা কী?

ফস করে পকেট থেকে তিনি একটা পাথরের টুকরো বার করলেন। তার একটা দিক চকচক করছে, আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

জগুদাদু অবাক হয়ে বললেন, এ তো দেখছি সত্যিই একটা হীরে! কোথায় পেলি?

বিশ্বামামা বললেন, তোমার পুকুরে। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলুম, প্রত্যেকটা কয়লার টুকরো যাচাই করে দেখেছি। এই একটিই পাওয়া গেছে। একটা অন্তত না পেলে ভাগ্নে দুটোর কাছে আমার প্রেস্টিজ পাংকচার হয়ে যেত।

আমাদের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলি তো? গাছ লক্ষ লক্ষ বছর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেলে কয়লা হয়ে যায়, তা জানিস তো? সেই কয়লা থেকে গ্র্যাফাইট, তার থেকে হীরে। তা হলে গাছ থেকেই হীরের জন্ম নয়?

জগুদাদু বললেন, এদিককার কোনো খনিতে কখনো কেউ পায়নি। তুই কী করে বুঝলি, এখানে হীরে থাকতে পারে?

বিশ্বমামা বললেন, আমাদের জাম্বোর হাতে গ্র্যাফাইটের টুকরোটা দেখে। অবশ্য গ্র্যাফাইট থাকলেই যে হীরে থাকবে তার কোনো মানে নেই। তবু একটা চান্স নিলাম। ক্ষতি তো কিছু ছিল না।

হীরের পাথরটা হাতে নিয়ে আমরা সবাই নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। সত্যি সত্যি হীরে!

বিশ্বমামা বললেন যে, এখন অনেক কাটাকুটি করতে হবে। ঠিক মতন কাটতে না পারলে এর থেকে জেল্লা বেরোয় না। তবে এটা যে আসল হীরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিলুদা বললেন, গ্র্যাফাইট থেকে যদি হীরে হয়, তা হলে গ্র্যাফাইটে খুব চাপ দিলে আরও হীরে বানানো যায় না।

বিশ্বমামা বললেন, না রে গবেট, সম্ভব নয়। কয়লা জিনিসটা আসলে কী?

কার্বন। গ্র্যাফাইটও কার্বন, হীরেও কার্বন। কিন্তু এদের পরমাণুর বিন্যাস আলাদা আলাদা। প্রকৃতির খেয়ালেই এরকম হয়, আমাদের সাধ্য নেই পরমাণু বিন্যাস বদলাবার।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, জগুমামা, এ হীরেটা যে আবিষ্কার করেছে, তারই পাওয়া উচিত। যদিও তোমার পুকুর থেকে উঠেছে।

জগুদাদু বললেন, তুই নিতে চাস তো নে, আমার আপত্তি নেই।

বিশ্বমামা বললেন, আমি কেন নেব? আমি তো আবিষ্কার করি নি। সে কৃতিত্ব জাম্বোকে দিতে হবে। জাম্বো যদি একটা গাছে হীরের ফুল না আঁকতো, তা হলে ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসতো না। দেখো, বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বের চেয়েও মানুষের কল্পনা কত শক্তিশালী। ঐটুকু একটা ছেলে, একটা গ্র্যাফাইটের টুকরো পেয়েই হীরের ফুল আঁকছিল কেন? এই হীরেটা আমরা জাম্বোকেই উপহার দেবো।

সবাই মিলে আমরা ডাকতে লাগলুম, জাম্বো, জাম্বো—।

শরদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (1994)-এ গল্পটি 'হীরে কি গাছে ফলে?' নামে প্রকাশিত হয়েছে।



বিশ্বমামার কারসাজি

বিশ্বমামা বললেন, ছোটবেলায় একটা ম্যাজিক দেখেছিলাম, বুঝলি! আজও সেটা ভুলতে পারি নি।

আমি বললুম, তুমি মোটে একটা ম্যাজিক দেখেছো? আমরা তো কত ম্যাজিক দেখেছি। পি সি সরকারের জাদুর খেলা দেখেছি অনেকবার।

বিশ্বমামা বললেন, আমিও কম ম্যাজিক দেখিনি। সব তো মনে থাকে না। সব মনে রাখার যোগ্যও নয়। এই একটা ম্যাজিকের কথা মনে খুব দাগ কেটে গিয়েছিল। আমরা তখন উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর স্ট্রিটে থাকি। মিঃ ফক্স নামে একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, কালো রঙের প্যান্ট-কোট আর মাথায় একটা লম্বা টুপি পরতেন। আসলে কিন্তু বাঙালি, এ রকম নাম নিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। আমাদের ইস্কুলে একবার ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন, অনেক সময় তো বড় রাস্তার মোড়ে দাড়িয়েও হঠাৎ ম্যাজিক দেখাতে শুরু করতেন।

বিলুদা বললো, রাস্তার ম্যাজিশিয়ান? তার মানে তো এলেবেলে!

বিশ্বমামা বললেন, নারে, স্টেজে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখানোই বরং অনেক সোজা। সেখানে অনেক যন্ত্রপাতির কারসাজি থাকে। কিন্তু রাস্তায়, সকলের চোখের সামনে খালি হাতে ম্যাজিক দেখানোর কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

বিলুদা বললো, খালি হাতে কেউ ম্যাজিক দেখায় না। আমি শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানদের কোটের পকেটে সব সময় কিছু ম্যাজিকের জিনিসপত্র থাকে। ওরা যে তাসের প্যাকেট নিয়ে খেলা দেখায়, সে-ও তো সাধারণ তাস নয়।

বিশ্বমামা বললেন, তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তবে ভালো ম্যাজিশয়ানরা খালি হাতেও কিছু কিছু খেলা দেখাতে পারে। সেটা হাতের কায়দা। মিঃ ফক্সের তেমন নাম ছিল না, কিন্তু সত্যি ভালো ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। কাচের গেলাস খেয়ে ফেলতেন, একটা রুমাল ঝেড়ে পায়রা বার করতেন, এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে দিতেন চোখের নিমেষে। এগুলো এমন কিছু না। কিন্তু আর একটা যে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন—

বিলুদা বাধা দিয়ে বললো, ম্যাজিকের গল্প শুনতে চাই না। তুমি একটা ম্যাজিক দেখাও।

বিশ্বমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, যাঃ, তবে বলবো না! ম্যাজিক দেখতে চাস, আমাকে দেখাতে হবে কেন, চারপাশে তাকালেই তো দেখতে পাবি। এই যে ফোঁটা ফোঁটা জলে সূর্য কিরণ পড়লে মস্ত বড় একটা রামধনু হয়ে যায় এক এক সময়, সেটা একটা ম্যাজিক না? সেটা হলো আকাশের ম্যাজিক। বটগাছের ফল দেখেছিস, এইটুকু একটা মেটে রঙের গুলির মতন, তার মধ্যে আবার খুদে খুদে বিচি আছে। এইটুকু একটা বটফল থেকে একটা বিশাল বটগাছ হয়, এটা ম্যাজিক বলে মনে হয় না? প্রকৃতির মধ্যে এরকম কত ম্যাজিক আছে!

আমি বিলুদার দিকে তাকিয়ে বললুম, আঃ, চুপ করো না। গল্পটা শুনতে দাও। বিশ্বমামা, তোমার মিস্টার ফক্সের গল্প বলো।

বিশ্বমামা বললেন, শুনবি? মিস্টার ফক্স অনেক ম্যাজিক দেখাতেন, কিন্তু একটা ম্যাজিকই আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য রাস্তার মোড়ে নয়, স্টেজেই দেখিয়েছিলেন। সেই ম্যাজিকটার নাম 'জাদু গাছ'! প্রথমে তিনি একটা হলদে পাতিলেবু হাতে নিয়ে সবাইকে দেখালেন। তারপর স্টেজের ওপর রাখা একটা টবে সেই লেবুটা আস্তই পুঁতে দিলেন। তারপর টবটার ওপর একটা কালো কাপড় চাপা দিয়ে কোটের পকেট থেকে বার করলেন একটা কাচের শিশি। তিনি বললেন, এর মধ্যে কী আছে জানেন? এক রকম আশ্চর্য সার, অর্থাৎ ফার্টিলাইজার। পৃথিবীর আর কেউ এই সারের খবর জানে না। এই সার দিলে কী হয় দেখুন। তিনি কালো কাপড়টার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেই শিশি থেকে খানিকটা কী যেন ফেলে দিলেন। তারপর কালো কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই টবে একটা পাতিলেবু গাছ গজিয়ে গেছে।

বিলুদা ঠোঁট উল্টে বললো, এ আবার হয় নাকি?

আমি বললুম, চুপ!

বিশ্বমামা বললেন, চোখের সামনেই দেখলাম তো! স্টেজে আর কেউ আসে নি। এখানেই শেষ নয়। মিস্টার ফক্স গাছটায় কালো কাপড় ঢাকা দিলেন।

আবার শিশি থেকে কিছু ঢাললেন। এরপর কাপড়টা তুলতেই দেখা গেল, সেই গাছটায় পাঁচ ছটা পাতি লেবু ফলে আছে। সত্যি সত্যি লেবু, কাগজের নয়! আমরা হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলাম।

বিলুদা বললো, এ আমি নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না!

বিশ্বমামা বললেন, তোরা সবজান্তা হয়ে গেছিস। আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম। আমার তখন এগারো বছর বয়েস। এটুকু বুঝতে শিখেছি যে এক টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করে ফেলা নিশ্চয়ই হাতের কারসাজি। এরকম হতে পারে না। যদি সত্যিই সম্ভব হতো, তা হলে মিস্টার ফক্স অনেকগুলো এক টাকার নোটকে একশো বানিয়ে বড়লোক হয়ে যেতে পারতো। তা তো হয় নি, লোকটি বেশ গরিবই ছিল, বুড়ো বয়েসে ছেঁড়া কোট গায়ে দিত। কিন্তু ঐ গাছ তৈরির ব্যাপারটায় আমায় খটকা লেগেছিল। সার দিলে সব গাছই বাড়ে। মিস্টার ফক্স হয়তো এমন কোনো শক্তিশালী সার আবিষ্কার করেছেন, যাতে কয়েক মিনিটে গাছ বড় হয়ে যায়।

বিলুদা বললো, তা হলে তো খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায় পৃথিবীতে। ধান গাছ পুঁতে ফসলের জন্য আর কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয় না। এক জমিতে একশো দুশো বার চাষ করা যায় বছরে। আজকে একটা কলাগাছ পুঁতলে কালকেই এক ছড়া পাকা কলা পাওয়া যাবে। কোনো কিছুরই অভাব থাকবে না।

বিশ্বামামা বললেন, আমিও সেইরকম ভেবেছি। মিঃ ফক্স তো পাড়ার লোক, তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, ঐ গাছের ম্যাজিকটা কি সত্যি? উনি ধমক দিয়ে বলতেন, সত্যি না তো কী! আমি মিথ্যে কিছু দেখাই না। যা ভাগ এখান থেকে! আমি গাছপালা নিয়ে পড়াশুনো করতে লাগলাম। আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন নি, একদিনে গাছ তৈরি করা যায়। তবে বীজ থেকে গাছ হতে কেন অনেক সময় লাগে, সেটা জেনেছি। তারপর অনেক বছর বাদে, মিস্টার ফক্স বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন, একদিন আমায় ডেকে আসল কথাটা ফাঁস করে দিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, দ্যাখ, এখন তো আর কেউ আমাকে ম্যাজিক দেখাতে ডাকে না, তাই তোকে বলতে আর বাধা নেই। আসলে তিনটে

টবের ব্যাপার। একটা খালি টব, একটাতে লেবুগাছ লাগানো টব, আর একটাতে লেবুগাছে, লেবু ফলে আছে। আমার একজন সহকারী সেই টবগুলো বদলে বদলে দেয়। স্টেজের একটা জায়গা কাটা রাখতে হয়, স্টেজের নিচে সহকারিটি লুকিয়ে বসে থাকে। আমি কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেই সে টব বদলে দেয়। বিলুদা হাসি মুখে বললো, আমি আগেই ধরেছি। তখনই বলেছি, একদিনের মধ্যে, এমনকি দু'তিন দিনের মধ্যেও ধান থেকে গাছ বেরুনো কিছুতেই সম্ভব নয়। কখনো কেউ দেখেনি!

বিশ্বমামা এবার চোখ বুঁজে বললেন, সম্ভব!

বিলুদা বললো, অ্যাঁ!

বিশ্বমামা বললেন, মিস্টার ফক্সের এ ম্যাজিক আমি ভুলতে পারি নি বলে ঐ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। এখন আমি নিজেই একদিনে বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিতে পারি।

বিলুদা অবিশ্বাসের সুরে বললো, যাঃ! কী বলছো তুমি!

আমি বললুম, বুঝেছি, আজ তুমি এক বাটি জলের মধ্যে কতকগুলো ছোলা ভিজিয়ে রাখো। কালই সেই ছোলার মুখ থেকে কল বেরুবে। সেও তো বীজ থেকে গাছ হওয়া।

বিলুদা বললো, ওটা তো ফাঁকিবাজি। ছোলার কল আবার গাছ নাকি?

বিশ্বমামা হাসতে হাসতে বললেন, নীলুটা প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঠিক আছে, ছোলা নয়, অন্য ফলের বীজ থেকে গাছ তৈরি করে দিলে হবে তো? লেবু গাছ, কিংবা আম গাছ?

বিলুদা বললো, আম গাছ তৈরি করে দেখাতে পারো তো বুঝবো, তুমি সত্যিই তুমি ম্যাজিক জানো!

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। আমার দু'দিন সময় লাগবে। ততক্ষণে মাটি তৈরি করবো। এর মধ্যে বাজার থেকে একটা বেশ পাকা দেখে আম জোগাড় কর। আমটা যেন খুঁতো না হয়, একেবারে বোঁটা থেকে ছেঁড়া।

দু'দিন বাদে সত্যিই ব্যাপারটা শুরু হলো। বিশ্বমামাদেরই বাড়ির পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। তার এক কোনে খানিকটা মাটি কাদা কাদা করা। তার

ওপরে একটা কাচের ঢাকনা দেওয়া। সেটা তুলে, পাকা আমটার খোসা খানিকটা ছাড়িয়ে সাবধানে পুঁতে দেওয়া হলো মাটিতে।

তারপর বিশ্বমামা বললেন, এবার শুরু হবে, শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই! দেখা যাক, কে জেতে!

বিলুদা বললো, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, সেটা কাল বুঝিয়ে দেবো।

আমি বললুম, কিন্তু বিশ্বমামা, তুমি যে চুপি চুপি করে এখানে এসে একটা চারা গাছ পুঁতে দিয়ে যাবে না,সেটা কী করে বুঝবো?

বিশ্বমামা বললেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার দুটো উপায় আছে। তোরা এখানেই সারাদিন, সারারাত বসে থাক, বসে বসে পাহারা দে। কিংবা, আমার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বক্ষণ থেকে যা। আমার ওপরেই নজর রাখ।

আমরা দ্বিতীয়টাই বেছে নিলুম।

দুপুরবেলা আমরা বিশ্বমামাকে নিয়ে গেলুম একটা সিনেমা দেখতে। সন্ধ্যের পর চীনে হোটেলে খাওয়া হলো। সব বিশ্বমামারই পয়সায় অবশ্য। আমরা পয়সা কোথায় পাবো?

খাওয়া দাওয়া সেরে গঙ্গার ধারে বেড়ালুম খানিকক্ষণ। বিশ্বমামা চেঁচিয়ে গান ধরলো। বিশ্বমামার গলায় একেবারে সুর নেই, বড্ড বাজে গান গায়। কিন্তু সে গান শুনেও আহা আহা করতে হলো। সিনেমা দেখিয়েছে, খাইয়েছে, এরপর কি আর গান খারাপ বলা যায়।

বাড়ি ফিরে খানিকক্ষণ গল্প হলো, তারপর ঘুম।

ভোর হতে না হতেই বিশ্বমামাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলুম।

বিশ্বমামা চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন, আঃ কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি তো? সূর্যের আলো ফুটেছে? ভালো করে রোদ না উঠলে কিছুই হবে না।

আমরা জানলার ধারে বসে রইলুম রোদ্দুরের প্রতীক্ষায়। বিশ্বমামা আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আটটা বাজার পর নিজেই উঠে পরে বললেন, চল, এবার দেখা যাক!

আমরা প্রায় দৌড়েই গেলুম বাগানে। তাজ্জব ব্যাপার! সত্যিই যেখানে



আমটা পোঁতা হয়েছিল, সেখানে দুটি পাতা সমেত একটা আমের চারা ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

বিলুদা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো।

বিশ্বমামা মুচকি মুচকি হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, দেখলি, দেখলি আমার ম্যাজিক। এখানে কোনো স্টেজ নেই। আমার কোনো সহকারি নেই, খালি হাতের ম্যাজিক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এরপর তুমি একদিনের মধ্যে এই গাছে আম ফলাতে পারো?

বিশ্বমামা বললেন, তাতো পারিই। সেটা করা এর চেয়ে সোজা। কিন্তু সেটা আমি করবো না। এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

বিলুদা এবার বললো, বিশ্বমামা, সত্যি তুমি তাক লাগিয়ে দিলে। এটা ম্যাজিক, না আমাদের চোখের ভুল! না বাস্তব!

বিশ্বমামা বললেন, ম্যাজিক, তবে বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

বিলুদা বললো, তা হলে আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও। তুমি তো আর মিস্টার ফক্স নও।

বিশ্বমামা বললেন, মাটিতে কোনো বীজ পড়লে, সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা দু'চার দিনের মধ্যে তার থেকে গাছ বেরোয় না। কেন? তা জানিস? বীজেরা ঘুমোয়। কেন ঘুমোয়? কোন্ মাটিতে পড়লো, সেখানকার আবহাওয়া কেমন, এসব তো বুঝে নিতে হবে ; তাই বীজ কয়েকদিন ঘুমিয়ে নেয়। সব বীজ কিন্তু ঘুমোয় না। নীলু যে কাল ছোলার কল বেরুবার কথা বলেছিল, তার মানে ছোলা, মটর এরা ঘুমোয় না। অধিকাংশ বীজই কিন্তু মাটির মধ্যে কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে।

আমি বললুম, তুমি সেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছো?

বিশ্বমামা বললেন, আমি নিজে ঠিক ভাঙাই নি। ঐ যে কাজ বললুম শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ! প্রত্যেক বীজের মধ্যে ডরমিন বলে একটা জিনিস থাকে। এই ডরমিনের জন্যই বীজকে ঘুমোতে হয়। এদিকে বীজ মাটিতে থাকতে থাকতে আর একটা জিনিস তৈরি হয়, তার নাম অকসিন। এই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলে, তার ফলেই বীজের ঘুম ভাঙে। অকসিন বেশি তৈরি হলেই বীজ থেকে গাছ বেরুতে শুরু করে। আমি এখানকার মাটি এমনভাবে তৈরি করেছি, যাতে প্রচুর অকসিন খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। সেই অকসিন এসে ডরমিনকে কাবু করে ফেলেছে, আর অমনি গাছ বেরিয়েছে।

বিলুদা বললো, উঁইরেকা। দারুন ব্যাপার। বিশ্বমামা, তুমি আর কাউকে বলবে না। এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাবো।

বিশ্বমামা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার। তুই হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লি কেন?

বিলুদা বললো, বাঃ হবো না? এরপর আমরা একটা বাগান কিনবো। সেখানে রোজ রোজ আম-জাম-পেয়ারা ফলাবো। প্রতিদিন গাছ হবে, প্রতিদিন ফল পাবো। রাশি রাশি ফল। সেইগুলো বিক্রি করলে বড়লোক হতে ক'দিন লাগবে?

বিশ্বমামা বললেন, একে বলে গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! এ জিনিস আমি শুধু একবারই করলাম, তোদের দেখাবার জন্য। আর কোনোদিন করবো না। প্রকৃতির একটা নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাকে আমি ভাঙতে যাবো কেন? কারুকে বড়লোক করবার জন্য আমি বিজ্ঞানচর্চা করি না!

বিলুদা বললো, তুমি নিজেও তো বড়লোক হবে। এত কষ্ট করে তুমি এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করলে, এখন তার ফল ভোগ করবে না?

বিশ্বমামা বললেন, তুই 'গীতা' পড়েছিস?

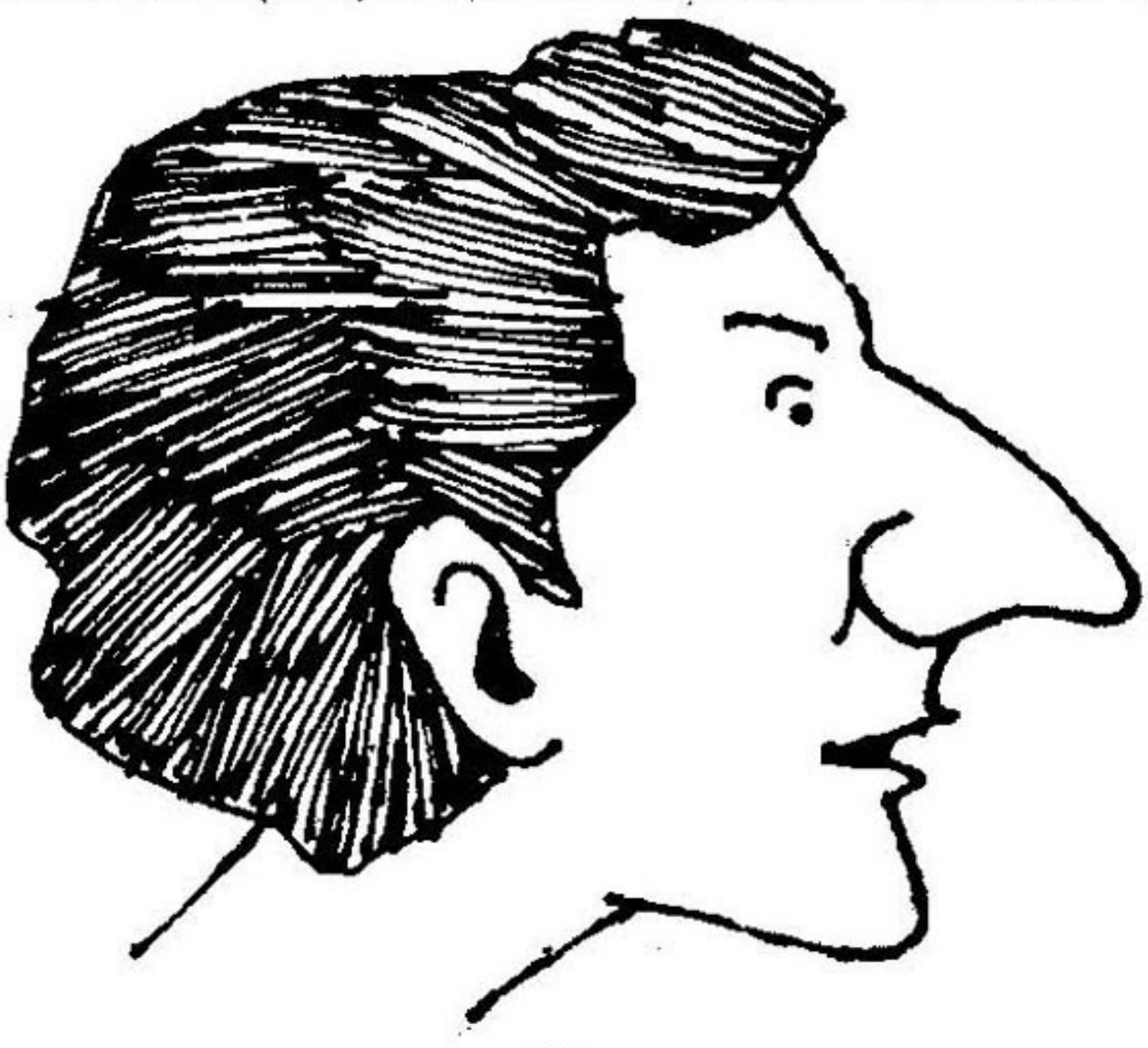
বিলুদা বললো, গীতা? সে তো খুব খটোমটো বই, পড়তে গেলে দাঁত ভেঙে যায়!

বিশ্বমামা বললেন, কখনো কষ্ট করে পড়ে দেখিস, তা হলে তখন বুঝবি, কেন আমি ফল ভোগ করতে চাই না।

তারপর বিশ্বমামা হাঁটু গেড়ে বসে সেই কচি আমপাতায় খুব যত্ন করে হাত বুলোত বুলোতে বললেন, এবার তোমরা নিজে নিজে বড় হও। আমি আর তোমাদের বিরক্ত করবো না। তোমাদের মায়ের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়েছি বলে লক্ষ্মীসোনা আমার ওপর রাগ করো না।

বিশ্বমামা এমনভাবে বলতে লাগলেন, যেন চারাগাছটা ওঁর সব কথা বুঝতে পারছে। বুঝে মাথা নাড়ছে একটু একটু।

শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (1995)-এ গল্পটি 'ম্যাজিসিয়ান বিশ্বমামা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।



বিশ্বমামার ম্যাজিক

বিশ্বমামা বললেন, আয়তো—রে নীলু আর বিলু। তোদের একটা ম্যাজিক দেখাই। কাছে আয়, কাছে আয়। হাত বাড়িয়ে দে।

আমাদের বিশ্বমামা সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। কখন যে কোথায় থাকেন, তার ঠিক নেই। কখনো হনুলুলু, কখনো ম্যাডাগাস্কার। ওঁর নামের সঙ্গে স্বভাবটা বেশ মিলে গেছে। বিশ্বমামা নিজেই বলেন, জানিস, ছোট বেলায় আমি যখন খুব দুষ্টুমি করতাম, তখন বাবা আমাকে বকুনি দিয়ে বলতেন, ছেলে একেবারে বিশ্ববখাটে হয়েছে! দ্যাখ, আমি সত্যি সত্যি তাই হয়েছি।

এবারে তিনি গিয়েছিলেন হিমালয়ের কোন এক দুর্গম অঞ্চলে।

তাতে আমরা বেশ নিরাশই হয়েছিলাম। কারণ বিদেশে গেলে বিশ্বমামা আমাদের জন্য অনেক রকম চকলেট আর টফি আনেন। প্রত্যেকবার নতুন নতুন ধরনের। সেই জন্য উনি ফিরলেই আমরা ওঁর চারপাশে লোভে লোভে ঘুরি। মা বারণ করে দিয়েছেন, কিছুতেই বিশ্বমামার কাছে থেকে কিছু চাওয়া চলবে না, কারণ তা হলে সবাই হ্যাংলা বলবে! আর বিশ্বমামাও এমন, ফেরার পরই যে আমাদের চকলেটগুলো ভাগ করে দেবেন, তা নয়। নিজের কাছে রেখে দেবেন আর এমন ভাব দেখাবেন, যেন কিছুই আনেন নি। তারপর দু'দিন তিন দিন পর হঠাৎ সেগুলো বার করবেন।

এবারে যে চকলেট আনেন নি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হিমালয়ে তো আর চকলেট পাওয়া যায় না।

বিদেশের বদলে হিমালয়ে কেন গিয়েছিলেন, তা-ও বলা মুশকিল। বিশ্বমামা যে সরাসরি কোনো প্রশ্নের দেন না।

বিলুদা জিজ্ঞেস করেছিল, উনি উত্তর দিয়েছিলেন, ঘাস রং করতে!

এমন অদ্ভুত কথা কেউ শুনেছে? ঘাস রং করা মানে কী? ঘাসে আবার কেন লোকে রং লাগাতে যাবে?

যাই হোক, বিশ্বমামার ম্যাজিক দেখার জন্য আমি আর বিলুদা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা একটা হাতে মুঠো করে কী যেন ধরে আছেন। সেটা দেখাবার আগে তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, নীলু তোর ছোট কাকার কিডনিতে পাথর হয়েছিল। অপারেশান করে সত্যি একটা পাথর পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি! মাঝারি সাইজের একটা গুলির মতন।

বিশ্বমামা বললেন, সেই পাথরটার গন্ধ শুকে দেখেছিস?

আমি বললাম, না তো, গন্ধ শুঁকবো কেন?

বিশ্বমামা এবার বিলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলু, ছুঁচো দেখেছিস? ছুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে বল তো!

বিলুদা বললো, তা আমি কী করে জানবো?

বিশ্বমামা বললেন, জানিস না। ও, তা হলে আর কী করে হবে!

বিলুদা বললো, ছুঁচোর গায়ে কেন গন্ধ থাকে তা জানি না বলে তুমি আমাদের ম্যাজিক দেখাবে না?

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁ, দেখাবো ম্যাজিক। যদি ধরতে পারিস, তা হলে আজ সন্ধেবেলা চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে যাবো। আর যদি না পারিস, তা হলে পাঁচটা করে অঙ্ক কষতে হবে।

বিশ্বমামা বসে আছেন একটা টেবিলের একধারের চেয়ারে। আমরা টেবিলের অন্যধারে।

তিনি বললেন, একে একে আয়। আগে কে?

বিলুদা সব ব্যাপারেই আমার ওপর সর্দারি করে। ও তো আগে যাবেই। মুখে কিছু না বলেই আমাকে ঠেলে এগিয়ে গেল।

বিশ্বমামার যে হাতটা মুঠো করা সেটা লুকোলেন টেবিলের তলায়। অন্য হাতটা দিয়ে বিলুদার বাঁ হাত আর ডান হাত একবার করে টিপে টিপে দেখলেন।

তারপর বললেন, ডান হাতটাই ঠিক আছে।

বিলুদার ডান হাতটা টেবিলের তলায় নিয়ে কী যেন করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। এবার তোর ডান হাতের তালুর গন্ধ শুঁকে দ্যাখ তো বিলু!

বিলুদা হাতখানা নাকের কাছে নিয়ে এলো! তার মুখখানা কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গেল। একটা গন্ধ সে পাচ্ছে বটে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

বিশ্বমামা বললেন, একটা গন্ধ পাচ্ছিস?

বিলুদা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ।

বিশ্বমামা বললেন, তোর হয়ে গেল। এবার নীলু তুই আয় কাছে।

আমি পাশে দাঁড়াতেই বিশ্বমামা আমারও দু'হাত টিপে দেখলেন। তার পর বাঁ হাত নিয়ে গেলেন টেবিলের তলায়। কী যেন একটা শক্ত মতন জিনিস ঘষে দিলেন আমার হাতের তালুতে।

আমি হাতটা নাকের কাছে নিয়ে এসে গন্ধ শুঁকলাম। আমারও অচেনা লাগালো গন্ধটা। কিন্তু বেশ তীব্র গন্ধ।

বিশ্বমামা বললেন, ব্যাস হয়ে গেছে! কী ব্যাপারটা হলো বুঝলি?

বিলুদা আপত্তি জানিয়ে বলেন, এ আবার কী ম্যাজিক? তুমি আমার ডান



হাতে কিছু একটা ঘষে দিলে। তাতে গন্ধ মাখানো ছিল, তাই আমার হাতে গন্ধ হয়েছে। এতে বোঝার কী আছে?

বিশ্বমামা বললেন, ওঃ ছো, আসল কথাটাই বলিনি বুঝি! বিলু, তোর ডান হাতে জিনিসটা ঘষেছি তো? ডান হাতে গন্ধ হতেই পারে। এবার বাঁ হাতটা শুঁকে দেখ! বাঁ হাতে তো কিছু ঘষিনি?

বিলুদা নিজের বাঁ হাত শুকলো। আমিও আমার ডান হাতটা শুঁকলাম। সত্যি তো, অন্য হাতেও গন্ধ এসে গেছে! এ তো সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।

বিশ্বমামা নিজের বাঁ হাত তুলে দেখালেন। সে হাতে কিছু নেই। ডান হাতটা মুঠো করা অবস্থায় উঁচু করলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, তোদের একটি হাত ঘষে দিলাম। সেই হাতের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি শরীরের মধ্যে দিয়ে অন্য হাতে চলে এলো কী করে? এই হলো ম্যাজিক। যাঃ, চিন্তা করে গিয়ে! বিকেলের মধ্যে বলতে না পারলে কিন্তু চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে যাবো না!

আমরা দু'জন সারা দুপুর ভাবলাম। মাথা-মুন্ডু কিছুই বোঝা গেল না। বিলুদা আমার ছোড়দির একটা সেন্টের শিশি লুকিয়ে নিয়ে এসে তার থেকে খানিকটা এক কানে মেখে বললেন, নীলু, আমার অন্য কানটা শুঁকে দ্যাখ তো গন্ধ এসেছে কি না।

আমি শুঁকে দেখলাম, না। গন্ধ টন্ধ কিছু নেই। এক দিকের গন্ধ কি কখনো অন্য দিকে যেতে পারে? বিশ্বমামার হাতে তা হলে কী অত্যাশ্চর্য জিনিসটা ছিল?

ডাল ঝিঙে-পোস্ত আর ইলিশমাছ দিয়ে অনেকখানি ভাত খেয়ে বিশ্বমামা এখন লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে প্রচন্ড। বিশ্বমামার মতন এত বড় নাক আমি আর কোনো মানুষের দেখিনি। ওঁর গায়ের রং ফরসা বলে আমরা ওঁর আর একটা নাম দিয়েছি নাকেশ্বর ধপধপে। অত বড় নাক, বেশি জোরে তো ডাকবেই।

বিলুদা বললো, কী রে, নীলু, তুই ম্যাজিকটা বুঝতে পারলি না?

আমি বললাম, তুমি পেরেছো?

বিলুদা বললেন, এসব ম্যাজিক-ফ্যাজিক ধরে ফেলা তো ছোটদেরই কাজ।

মাথা ঘামাস না কেন? চাইনিজ খাবি কী করে?

—তুমিও খেতে পারছ না।

—এক কাজ করবি নীলু? আমি দেখেছি বিশ্বমামা হাতের সেই জিনিসটা বালিশের নিচে রেখেছে। টপ করে একটু করে বার করে নিয়ে দ্যাখ না।

—যদি জেগে ওঠে? খুব রেগে যায়?

—এত নাক ডাকছে, এখন ঘুম ভাঙবেই না।

—তাহলে তুমি বার করে আনো।

—এসব ছোটদের কাজ। আমি পাহারা দিচ্ছি। ঘুম ভাঙলেই ওকে অন্য কথা বলে ভোলাবো। তুই জিনিসটা নিয়ে আয়!

আমি খুব আস্তে আস্তে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢোকালাম একটা শক্ত মতন কিছু ঠেকলো। বার করে এনে দেখি, সেটা একটা মূর্গির ডিমের মতন জিনিস। ওপরে লোম রয়েছে। কিন্তু এমনই শক্ত যে মনে হয় একটা গোল পাথরকে লোমওয়ালা চামড়া দিয়ে মুড়ে বাঁধানো।

বিলুদা ফিসফিস করে বললেন, কস্তুরি! কস্তুরি! হরিণের পেটে থাকে।

কস্তুরির কথা আমিও শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়েছি ঃ

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরি মৃগ সম!'

কিন্তু কস্তুরি বলে যে সত্যিই কিছু আছে তাও জানতাম না, কোনোদিন চোখেও দেখিনি!

বিলুদা বললেন, রেখে দে ওটাকে, আবার জায়গায় রেখে দে! তা হলে আজ চাইনিজ খাওয়া হচ্ছেই।

এই সময় বিশ্বমামা জেগে উঠে বসলেন। বিলুদা বললেন, কস্তুরি! বুঝে গেছি!

বিশ্বমামা বললেন, কস্তুরি? বটে! কস্তুরি কাকে বলে জানিস?

বিলুদা বললেন, হ্যাঁ জানি। এক ধরনের হরিণের পেটে হয়।

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ! কস্তুরি চিনিস দেখছি। হিমালয়ের এক ধরনের হরিণ যাদের বলে মাস্ক ডিয়ার, তাদের পেটে হয়। জানিস নীলু, তুই যেটা ধরে

আছিস, সেটাকে বলতে পারিস, আমাদের দেশের সেরা কস্তুরি। আর হিমালয়ের হরিণদের পেটে কস্তুরি পাথর জন্মাচ্ছে না। আমি এবার সে ব্যবস্থা করে এসেছি।

বিলুদা বললো, সে কি! তুমি এটা করলে কেন? কস্তুরি তো খুব দামি জিনিস।

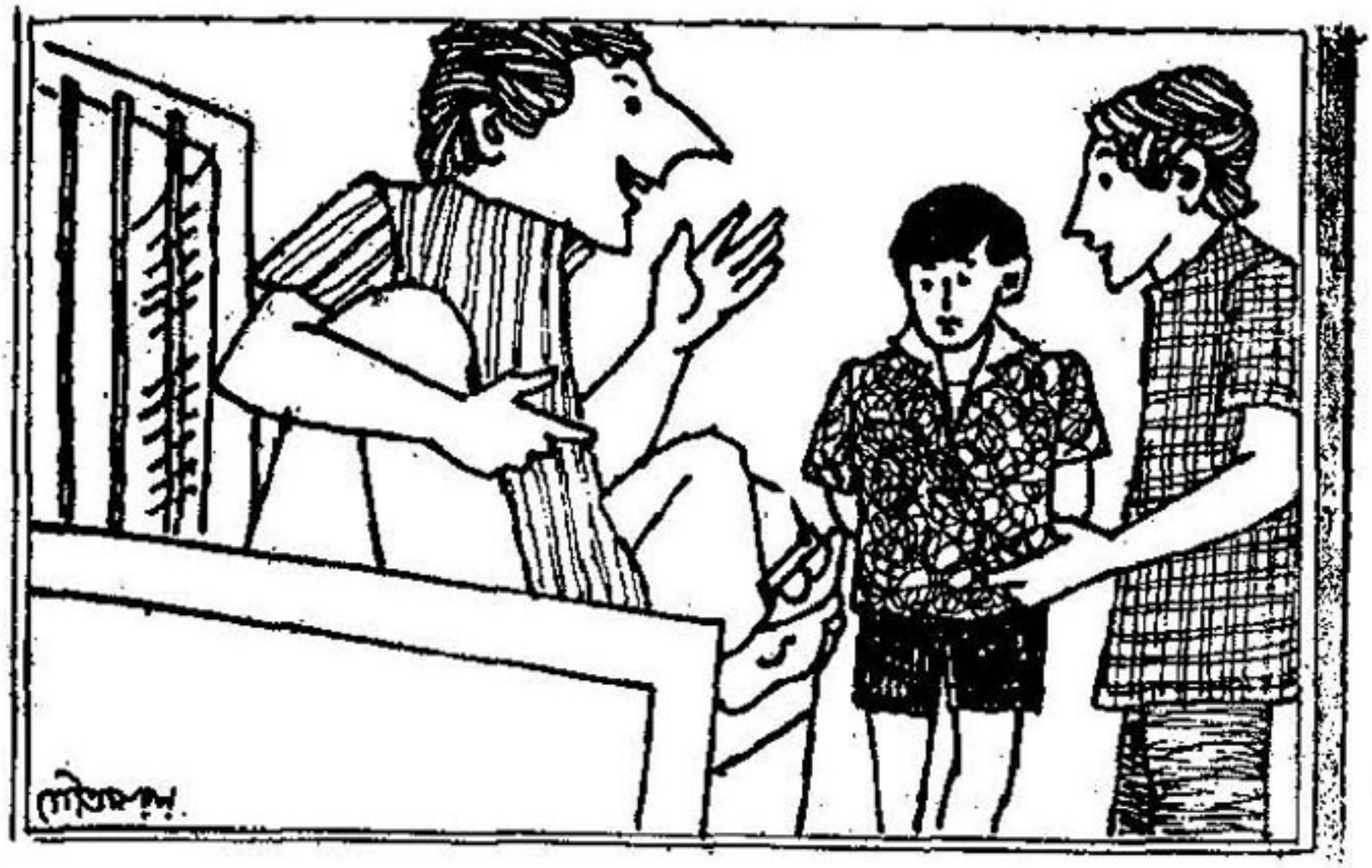
বিশ্বমামা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, দামি জিনিস। তাই লোকে এই বেচারা সুন্দর হরিণগুলোকে মেরে মেরে শেষ করছে, তারপর পেট কেটে কস্তুরি বার করবে! কেন, ওরা কী দোষ করেছে? মানুষের কিডনিতে যেমন পাথর হয়, ঐ হরিণদেরও নাভি কোষে পাথর জন্মায় আপনা আপনি। সেই জন্য মানুষ ওদের মারবে? খবরের কাগজে পড়েছিলাম। হিমালয়ে লোকে প্রচুর ঐ হরিণ মারছে কস্তুরির লোভে! তা পড়েই আমার গা জ্বলে গেলে। মনে মনে বললাম, দেখাচ্ছি মজা! আমি এমন একটি কেমিক্যাল আবিষ্কার করলাম, যাতে ঐ পাথর গলে যায়। সেই পাথর নিয়ে চলে গেলাম হিমালয়ে।

বিলুদা বললেন, তুমি তোমার সেই ওষুধ হরিণ ধরে ধরে ইঞ্জেকশান দিলে নাকি?

বিশ্বমামা বললেন, তা তো আর সম্ভব নয়! গোপনে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ঐ হরিণগুলো ঠিক কোন জায়গায় থাকে আর কী ধরনের ঘাস খায়। সেই ঘাসের ওপর আমার ওষুধ ছড়িয়ে দিয়েছি বেশ করে। সেই ঘাস খেয়ে কয়েক দিনের মধ্যে ওদের পেটের সব পাথর গলে গেছে। শুধু তাই নয়, এর পর যে বাচ্চা জন্মাবে, তাদেরও কস্তুরি হবে না। শিকারীরা এর পরেও দু'তিনটে হরিণ মেরেছিল, পেটে কিছু পায় নি। ঐ হরিণ মারা এমনিতেই নিষেধ। এখন সবাই বুঝে যাচ্ছে, কস্তুরির জন্য শুধু শুধু অত সুন্দর হরিণ মেরেও আর কোনো লাভ হবে না।

আমি বললাম, তা হলে আর কস্তুরির গন্ধ কেউ পাবে না?

বিশ্বমামা বললো, কেন পাবে না? সিভেট নামে এক ধরনের বেড়াল আর মাস্ক র‍্যাট নামে এক ধরনের ইঁদুরের পেটেও ঠিক এই রকম গন্ধওয়ালা পাথর হয়। সত্যি কথা বলছি, ইঁদুর মারলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তা ছাড়া এখন



কস্তুরির গন্ধওয়ালা কেমিক্যাল তৈরি হয়, তার নাম সিভেটোন। কিছু কিছু ওষুধও তৈরি হয় এটা দিয়ে।

বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, তা হলে আজ আমরা কোথায় চাইনিজ খেতে যাচ্ছি?

বিশ্বমামা বললেন, আগে আমার ম্যাজিকটার কী হলো সেটা বল! এখনো তো পারিস নি!

বিলুদা বললো, এ তো খুব সোজা! কস্তুরির খুব তীব্র গন্ধ তুমি এক হাতে মাখিয়ে দিলে, তাই অন্য হাতে গন্ধ পাওয়া গেল।

বিশ্বমামা হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, মোটেই না। হলো না। একী তুই বীজ পুঁতলি হাওড়ায় আর গাছ গজালো কলকাতায়! কস্তুরি কেন, পৃথিবীর কোনো গন্ধই এক হাতে লাগালে তারপর সারা দেহ ঘুরে সেটা অন্য হাতে পৌঁছোতে পারে না।

আমি আর বিলুদা পরস্পরের দিকে তাকালাম।—তা হলে?

বিশ্বমামা বললেন, বুঝতে পারলি না তো? আমার ডান হাতে ছিল কী, ঐ কস্তুরিটা? আর অন্য হাতে? কিছুই না। আমায় যদি কেউ এই ম্যাজিকটা

দেখাতো, তা হলে আমি সেই ম্যাজিশিয়ানের বাঁ হাতের গন্ধ শুঁকে দেখতাম।

বিলুদা বললো:, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, এই যে কস্তুরিটা দেখছিস, এটাতে আসলে বেশি গন্ধই নেই। এর লাল চামড়া তুলে ফেলে জিনিসটা তুলে ফেলা হয়। তখনই ভালো গন্ধ বেরোয়। ঐ জন্য হরিণরা যখন স্নান করে, কিংবা বৃষ্টিতে ভেজে, তখনই নিজের গায়ের গন্ধটা ঠিক ঠিক পায়। খানিকটা কনসেনট্রেড কস্তুরির নির্যাস আমি আমার বাঁ হাতে লাগিয়ে রেখেছিলাম। ঐ হাত দিয়ে যা ধরবো তাতেই গন্ধ হবে। ঐ হাত দিয়ে আমি তোদের অন্য হাত দুটো ধরেছিলাম, মনে নেই!

বিলুদা বললেন, তুমি আমাদের ঠকিয়েছো?

বিশ্বমামা বললেন, ঠকিয়েছি কী রে, এটাই তো ম্যাজিক। তা হলে চাইনিজ খাওয়া হলো না। পাঁচখানা করে অঙ্ক কষতে হবে। অঙ্কগুলো যদি রাইট হয়, তখন না হয় চাইনিজ খাওয়ার কথা আবার ভেবে দেখা যাবে!



বিশ্বামামার গোয়েন্দাগিরি

সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিশ্বমামা একটা বিরাট হুংকার দিয়ে বললেন। হুঁঃ! আবার বুজরুকি!

আমি আর বিলুদা ঘরের মেঝেতে বসে সাপলুডো খেলছিলুম। আমার ঘুঁটিটা একবারে আটানব্বইয়র ঘরে এসে একটা বিরাট সাপের মুখে পড়ে গেল!

বিলুদা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে বিশ্বমামা? বিশ্বমামা লম্বা নাকের ডগায় একটা আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, আমাদের এখানে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। ঝাড়গ্রামে এক সন্ন্যাসী নাকি যজ্ঞ করে মন্ত্র পড়ে পর পর দু'দিন বৃষ্টি নামিয়েছে! ছিঁটেফোটা নয়, দারুণ বৃষ্টি।

বিলুদা কাগজটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো। ঝাড়গ্রামের কাছে বিনপুর নামে একটা জায়গায় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মেঘ দমন যজ্ঞ করেছে। যজ্ঞ শুরু করার আগেই সে সবাইকে বলে দিয়েছিল যে এক ঘন্টার মধ্যে সে বৃষ্টি নামিয়ে দেবে। অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। সত্যি সত্যি হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সবাইকে ভিজিয়ে দিল। এ রকম দু'দিন ঘটেছে।

বিলুদা বললেন নিজস্ব সংবাদদাতা এ খবর পাঠিয়েছে। তা হলে কি এটা মিথ্যে হতে পারে?

বিশ্বমামা হেসে বললেন, খবরের কাগজের সব খবর বুঝি সত্যি হয়? 'খবর' কথাটা কী ভাবে তৈরি হয়েছে জানিস? খারাপের খ, বদ লোকের ব, আর রং চড়ানোর র। দেখবি সব খারাপ খবর। কোথায় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে বহু লোক মারা গেছে, কোথায় ডাকাতি হয়েছে, কোথায় দলাদলিতে সরকার ভেঙে যাচ্ছে। এই সবই বড় বড় করে লেখা হয়। ভালো খবর কিছু থাকে? ভালো লোকদের চেয়ে বদ লোকেরাই বেশি পাত্তা পায়। যে যত বেশি টাকা চুরি করে, তার নাম তত বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। আর রং চড়ানো, কোথায় সামান্য

কিছু একটা ঘটলেও খবরের কাগজের লোকেরা অনেক রং চড়িয়ে, বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখে।

বিলুদা বললো কিন্তু বিশ্বমামা, তোমার সম্পর্কেও তো মাঝে মাঝে খবরের কাগজে লেখা হয়। তোমরা আবিষ্কারের খবর। সেটা তো খারাপ খবর না, তুমি বদ লোক নও, রংও চড়ায় না! তা হলে?

বিশ্বমামা বললেন, তা কি প্রথম পাতায় ছাপে? ভেতরের দিকে ছোট ছোট অক্ষরে, যাতে লোকের চোখে না পড়ে। তা-ও সাংবাদিকদের যা অভ্যেস একটু আধটু রং না চড়িয়ে পারে না। একবার একটা কাগজে লিখে দিল, আমি নাকি সাড়ে ছ'ফুট লম্বা! আমি মোটে ছ' ফুট এক ইঞ্চি, কতখানি বাড়িয়ে দিল দেখলি?

আর লুডো খেলা হবে না বুঝতে পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, বিশ্বমামা মানুষ ইচ্ছে করলে বুঝি বৃষ্টি নামাতে পারে না? তবে যে শুনেছিলুম, আকবরের সভায় যে মস্তবড় গায়ক ছিলেন তানসেন, তিনি নাকি মেঘমল্লার গান গেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছিলেন?

বিশ্বমামা বললেন, মানুষ বৃষ্টি নামাতে পারবে না কেন? আমিও পারি। তবে গান গেয়ে কিংবা মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামানো যায় না। কারণ মেঘের কান নেই। মেঘ শুনবে কী করে? তানসেন আসলে এত ভালো গান গেয়েছিলেন তা শুনে অনেক লোক কেঁদে ফেলেছিল। সেই চোখের জলের বৃষ্টি নেমে ছিল।

বিলুদা বললো, তুমি বৃষ্টি নামাতে পারো?

বিশ্বমামা অবহেলার সঙ্গে বললো পারবো না কেন? এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

আমি বিশ্বমামার কাছে গিয়ে বললুম, একটু দেখাও না! এইখানে একবার বৃষ্টি নামিয়ে দেখাও! কতদিন বৃষ্টি হয় নি!

বিশ্বমামা বললেন, জানলা দিয়ে দেখ তো, আকাশে মেঘ আছে কি না!

আমরা দুই ভাই ছুটে গেলুম জানলার কাছে। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই, আকাশ একেবারে খটখটে!

বিশ্বমামা ভুরু নাচিয়ে বলেন, তা হলে তো হবে না! মেঘ থাকলে আগে

আগে বৃষ্টি নামানো যায় যদিও তাতে অনেক ব্যবস্থা লাগে কিন্তু মেঘ না থাকলে বৃষ্টি নামানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ একেবারে মেঘ তৈরি করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করে নি।

বিলুদা বললেন, এখানে না থাকলেও ঝাড়গ্রামে হয়তো মেঘ করেছে! তাই সাধুটি বৃষ্টি নামাতে পেরেছেন।

বিশ্বমামা বললেন, ঝাড়গ্রামে মেঘ হতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু তাতে সাধুটির কোনো কেরামতি থাকতে পারে না। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে জানিস তো, 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে'! তার মানে জানিস? একটা তালগাছের তলায় একটা কাক বসে ছিল, একজন ফকির তার শিষ্যদের বললেন, আমি মন্ত্র পড়ে ঐ কাকটাকে মেরে ফেলতে পারি। ফকির তো মন্ত্র আউড়িয়েই চলেছে, এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠলো, আর তালগাছ থেকে খসে পড়লো একটা পাকা তাল। পড়বি তো পর, সেটা ঠিক পড়লো ঐ কাকটার ওপর, তাতে কাক বেচারি মারা গেল। ফকির বললেন, দেখলে, দেখলে আমার কেরামতি! আসলে কিন্তু ঝড় না উঠলে তালও তখন পড়তো না, কাকটাও মরতো না। একেই বলে কাকতালীয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ঠিক ঐ সময়েই ঝড় উঠলো কেন?

বিশ্বমামা বললেন, সেদিন হঠাৎ ঝড় উঠেছিল বলেই তো গল্পটা দাঁড়িয়েছে। ঐ ফকিরকে যদি বলা যায়, আর একবার মন্ত্র পড়ে ঝড় তোলো। সে পারবে পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

বিলুদা বললো, কিন্তু এখানে যে লিখেছে, সাধু যজ্ঞ করে পরপর দু'বার বৃষ্টি নামিয়েছে?

বিশ্বমামা বললেন, হুঃ। তা বটে। হ্যাঁরে, তোদের ছোটকাকার দেশের নাম কী রে?

বিশ্বমামা হঠাৎ আচমকা এমন এক একটা কথা বলে, যার কোন কারণই বোঝা যায় না। এই সময় হঠাৎ ছোটকাকার দেশের প্রসঙ্গ আসে কী করে?

বিলুদা বলেলেন, ছোটকাকার দেশের নাম তো ভল্টুদা!

বিশ্বমামা ধমক দিয়ে বললেন, ভালো নাম কী? ভল্টুদা বললে কেউ চিনবে?

আমি মাথা চুলকোতে লাগলুম। তাই তো ভল্টুদার ভালো নামটা কী যেন? মনে পড়ল না।

বিলুদা বললেন, প দিয়ে নাম। প্রফুল্ল, প্রশান্ত? না, না, প্রাণগোপাল, না প্রমথেশ, তা-ও না।

বিশ্বমামা বললেন প দিয়ে হাজারটা নাম হয়। তোর মায়ের কাছ থেকে জেনে আয়—

তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেল। ভল্টুদার ভালো নাম প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শী মুখার্জী!

বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু এখন ঝাড়গ্রামের এস. ডি. ও, তাকে ফোন করলেই তো আসল ঘটনা জানা যাবে!

বিশ্বমামা টেলিফোনের কাকে গিয়ে বললেন, একবারেই লাইন পাওয়া গেল। খোদ ভল্টুদার সঙ্গেই কথা-বার্তা শুরু হলো। খানিকক্ষণ কথা বলার পর বিশ্বমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, এক গাঁট্টা মারবো! তোর কানটা মুলে দেবো! তুইও মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস!

ফোনটা রেখে দিয়ে বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু নিজের চোখে বৃষ্টি পড়তে দেখেছে। চল তো, ঝাড়গ্রামে গিয়ে আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে আসি! যদি মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারে, তাহলে আমার বিজ্ঞান পড়া ব্যর্থ হয়ে যাবে!

আমরা লাফিয়ে উঠলুম। আর কিছু না হোক ঝাড়গ্রামে বেড়াতে যাওয়া হবে তো। ভারি সুন্দর জায়গা। কাছাকাছি জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে।

বিশ্বমামার পুরোনো গাড়ি, মাঝে মাঝে রাস্তায় থেমে যায়, তখন আমাদের ঠেলতে হয়। এবারে সে রকম কিছু হলো না। মাঝপথে একটা ধাবায় থেমে চমৎকার গরম গরম রুটি-মাংস খাওয়া হলো।

আমাদের ভল্টুদা ঝাড়গ্রামের এস. ডি. ও সাহেব, সবাই তাকে খুব খাতির করে। যে-কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলে তার বাংলো দেখিয়ে দেয়। বিলুদা

আমায় বললেন, সাবধান নীলু, এখানে লোকজনের সামনে ভল্টুদা বলে ডাকবি না। বলবি প্রিয়দা, কিংবা ছোড়দা।

সে বাংলোয় পৌঁছে বিলুদা নিজেই আগে ভল্টুদা বলে ডেকে বসলো। বিশ্বমামা, একগাদা লোকের সামনে বললেন, এই ভল্টু খবর না দিয়েই চলে এলুম তোর এখানে।

ভল্টুদা অবশ্য আমাদের দেখে খুব খুশি। মস্ত বড় বাংলো, থাকবার জায়গার কোনো অসুবিধে নেই।

সন্ধ্যেবেলা বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে শোনা গেল আসল কাহিনী।

সন্তোষ মিত্র নামে এক ভদ্রলোক জার্মানীতে থাকতেন। বছর চারেক আগে এখান থেকে খানিকটা দূরে বিনপুরে অনেকখানি জমি কিনে বসবাস করছেন। একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়িও বানিয়েছেন, ফলের বাগান আছে, তাতে লাগিয়েছেন অনেক রকম ফলের গাছ। লোকটির ব্যবহার ভালো, বিনপুরের লোকেরা তাকে পছন্দ করে।

গত বছর এখানে ভালো বৃষ্টি হয় নি। এ বছরও এখনো বৃষ্টির দেখা নেই। সেই জন্য সন্তোষ মিত্র একজন সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছেন। এ সাধু অন্য সময়ে থাকেন হিমালয়ে, তাঁর অনেক রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যজ্ঞের সময় তিনি মন্ত্র পড়ে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামিয়েছেন। একবার নয়, দু'বার, একবার হলে বলা যেত কাকতালীয়। প্রথমদিন অনেকেই ব্যাপারটা জানতো না। বৃষ্টি নামার পর দলে দলে লোক ছুটে গেল যজ্ঞ দেখার জন্য। দ্বিতীয় দিন সাধু যজ্ঞে বসার আগে সবাইকে বলে দিলেন, কেউ টু শব্দ করবে না। সবাইকে চুপ করে থাকতে হবে। এক ঘন্টার মধ্যে আমি বৃষ্টি নামিয়ে দেব।

বিশ্বমামা ভল্টুদাকে জিজ্ঞেস করলেন তুই ছিলি সেখানে, তুই দেখেছিস?

ভল্টুদা বললেন হাঁ দেখেছি। নিজের চোখেই দেখেছি?। অবিশ্বাস করবে কী করে?

বিশ্বমামা বললেন কী দেখলি, ভালো করে বল।

ভল্টুদা বললেন, যজ্ঞের কাছেই আমাকে একটা চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল। দাউ দাউ করে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। তার দু'দিকে বসে আছে সন্তোষ মিত্র আর সেই সাধু। সাধুটি আগুনে ঘি ছিটোচ্ছেন আর মন্ত্র পড়ছেন। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে জল পড়তে লাগলো সেই আগুনে। তারপরই একেবারে বৃষ্টি। আমাদের দৌড়ে যেতে হলো বাড়ির মধ্যে।

বিশ্বমামা প্রবল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, হতে পারে না! এ হতে পারে না। আসলে মেঘ ছিল আগে থেকে।

ভল্টুদা বললেন, তা ছিল!

বাইরে একটা জিপ গাড়ি থামলো এই সময়ে। তার থেকে নেমে এলেন একজন অচেনা লোক।

ভল্টুদা বললেন, ঐ তো এখানকার পুলিস সাহেব এসে গেছেন। এঁকে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু বিশ্বমামা, প্লিজ, ওঁর সামনে আমাকে ভল্টু বলে ডেকো না।

পুলিস সাহেবের নাম দিগবিজয় সরকার। আলাপ পরিচয় হলো। তারপর বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ মশাই আপনিও সাধুকে বৃষ্টি নামানো দেখেছেন?

সরকার সাহেব বললেন, হ্যাঁ দেখলুম তো! আরও অন্তত পাঁচশো লোক দেখেছে! এর মধ্যে জাল জোচ্চুরি কিছু নেই। সাধু মন্ত্র পড়লো আর বৃষ্টি নামলো।

বিশ্বমামা আবার জোর দিয়ে বললেন, এ হতে পারে না!

সরকার সাহেব বলেন, আমিও মন্তর-টন্তর কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সাধুটি সত্যি তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আরও আশ্চর্য কথা কী জানেন, সন্তোষ মিত্রের বাড়ি-বাগান নিয়ে পঁচিশ বিঘে জমি। বৃষ্টি পড়েছে শুধু এ পঁচিশ বিঘের মধ্যে। অন্য সব জায়গা শুকনো খটখটে।

ভল্টুদা বললেন। উনি খরচ-পত্র করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন, তাই শুধু নিজের জমিতেই বৃষ্টি নামিয়েছেন।

বিশ্বমামা পুলিস সাহেবকে বললেন, আপনার ঐ সাধুকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল!

পুলিস সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সে কী? অ্যারেস্ট করবো কী অপরাধে? নিজের জমিতে বসে কেউ যদি পূজো বা যজ্ঞ করে, সেটা তো দোষের কিছু না'!

বিশ্বমামা বললেন, ভল্টু, ইয়ে থুড়ি, প্রিয়দর্শী। আমরা একবার বিনপুরে ঐ বাড়িটা গিয়ে দেখতে পারি?

ভল্টুদা বললেন, হ্যাঁ, আমি নিয়ে যেতে পারি। সেই সাধু এখনো রয়েছেন তার সঙ্গেও কথা বলতে পারো। বোধহয় আরও বৃষ্টির জন্য আবার যজ্ঞ করবে।

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। আমার অন্য পরিচয় দিবি না। শুধু বলবি, তোর আত্মীয়। এমনিই বেড়াতে এসেছি।

ভল্টুদা বললেন, ঠিক আছে, আজ তো রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে যাওয়া যাবে।

বিশ্বমামা বললেন, সন্তোষ মিত্র জার্মানি ফেরত অথচ সাধুকে দিয়ে যজ্ঞ করায়, সরকার সাহেব বললেন, আজকাল বিদেশে অনেক সাহেব-মেমও এ সবে বিশ্বাস করে। সত্যি মন্ত্রের জোর আছে বটে।

বিশ্বমামা এরপর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। অন্য সময় বিশ্বমামা কত মজার গল্প বলেন। এখন আর তাতে মন নেই। ভল্টুদা আর পুলিশ সাহেব, এরা তো মিথ্যে কথা বলবে না। একজন সাধু মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামিয়েছে, ওরা নিজের চোখে দেখেছে, তা শুনে বিশ্বমামা কি ঘাবড়ে গেলেন! মন্ত্রের কাছে বিজ্ঞানও হার মানলো?

আমরা অন্য গল্প করতে লাগলুম, বিশ্বমামা চুপ।

পরিষ্কার আকাশ। অনেক তারা ফুটে আছে, বাইরের আকাশে তারগুলোকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। একটা প্লেন উড়ে গেল, কী সুন্দর দেখালো সেটাকে।

বিশ্বমামা এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, মাঝে মাঝে প্লেনের শব্দ শুনছি। এখান দিয়ে এত প্লেন যায় কোথায়?

ভল্টুদা বললেন, কাছেই তো কলাইকুণ্ডা। সেখানে আমাদের এয়ার ফোর্সের একটা বেস আছে। সেখান থেকে প্লেন ওড়ে, এই শব্দ শোনা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বললেন, আমার বাংলোর পাশেই ট্রেন লাইন। মাঝরাত্রে ট্রেনের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার এখনো অভ্যেস হয় নি!

এক সময় খাবারের ডাক পড়লো, দারুন ব্যবস্থা করেছেন ভল্টুদা, প্রথমে ভাতের সঙ্গে দু'রকম মাছ, তারপর গরম গরম লুচির সঙ্গে মাংস। তিন রকম মিষ্টি।

বিশ্বমামা এত খাদ্যরসিক, আজ কিছুই প্রায় খেলেন না। মিষ্টিগুলো ছুঁলেন না পর্যন্ত। বিশ্বমামার এরকম মন আমি কখনো দেখিনি।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমার রওনা দিলুম বিনপুরের দিকে।

বেশ দূর নয়, বড় রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে সন্তোষ মিত্রের বাড়ি। চারদিকে শুকনো শুকনো ভাব, এই বাড়ীর বাগানে গাছগুলো বৃষ্টির জল খেয়ে বেশ তরতাজা। ফলের গাছগুলো বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কাছে ফল ধরেছে। কয়েকটা কলা গাছে কলা ফলে আছে।

সন্তোষ মিত্র একজন মাঝবয়েসী অমায়িক ভদ্রলোক। ভল্টুদার সঙ্গে এসেছে বলে আমাদেরও খাতির করলেন খুব। বাড়ির সামনে মস্ত বড় বারান্দা, তাতে অনেক চেয়ার পাতা।

একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় বাঘের চামড়ায় আসনে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী। মাথায় জটা, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। তিনি সিগারেট খাচ্ছেন, আর একটা খবরের কাগজ পড়ছেন। কোনো গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীকে সিগারেট টানতে আমি আগে দেখিনি। শুনেছিলাম সন্ন্যাসীরা গাঁজা খায়।

বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে সন্তোষ মিত্র জোর করে আমাদের ডব্‌ল ডিমের ওমলেট খাওয়ালেন। বিশ্বমামা নিজেরটা কিছুতেই খেতে চাইলেন না পরে বিলুদা টপ করে প্লেটটা নিজের কাছে নিয়ে নিল।

আমি চুপি চুপি বিলুদাকে বললুম, আমাদের বিশ্বমামাও বৃষ্টি নামাতে পারেন বলেছিলেন। এই সাধুর সঙ্গে বিশ্বমামার একটা কমপিটিশন হলে ভালো হয় না?

বিলুদা বললেন, চুপ। বিশ্বমামা রেগে আছে। এখন কিছু বলতে যাস নি!

বিশ্বমামা সন্তোষ মিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সাধুজীকে আপনি পেলেন কোথায়?

সন্তোষ মিত্র বললেন, গত বছর আমি হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আলাপ। কথায় কথায় বলেছিলাম, ঝাড়গ্রামের কাছে অনেক টাকা খরচ করে মস্ত বাগান করেছি কিন্তু জলের অভাবে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। পরপর দু'বছর ভালো বৃষ্টি হয়নি। এদিককার পুকুরও শুকিয়ে যায়, কুয়োতে জল থাকে না। তা শুনে সাধুজী বললেন, এ আবার সমস্যা নাকি? আমি ইচ্ছে করলেই বৃষ্টি নামিয়ে দিতে পারি। তাই ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছি।

বিশ্বমামা জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি সাহারা মরুভূমতেও বৃষ্টি নামাতে পারেন?

সন্তোষ মিত্র তাতে খানিকটা অখুশি হয়ে বললেন, জেনে আমার দরকার কী? আমার বাগানে জল পেলেই হলো!

বিশ্বমামা বললেন, তা ঠিক! আপনার বাগানটি চমৎকার হয়েছে। আশে পাশে এমন সুন্দর ফলের বাগান কারুর নেই।

এরপর বিশ্বমামা উঠে গেলেন সাধুটির কাছে।

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম।

বিশ্বমামা বললেন, নমস্কার সাধুজী! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আনেক শুনেছি।

সাধু হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

বিশ্বমামা আমাদের বললেন, প্রণাম কর, প্রণাম কর, ভালো অভিনেতা। ভালো অভিনতাও তো একজন গুণী।

সাধু এবার কটমট করে তাকালেন বিশ্বমামার দিকে। কড়া গলায় বললেন



তুমি বুঝি বিশ্বাস করো না? হাজার খানেক লোক আমার মন্ত্রশক্তি দেখেছে। তোমরা আজকালকার ছেলে, দু'পাতা ইংরিজি পড়েই সবজান্তা হয়ে গেছ। ঠাকুর-ফাকুর মানো না, ধর্ম মানো না! সেই জন্যই তো দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে! যত্তসব অকালকুষ্মান্ড!

গালাগালি খেয়েও কিন্তু বিশ্বমামা চটলেন না। হাসি মুখে বললেন, রাগ করছেন কেন? সকলকেই কিছু না কিছু অভিনয় করতে হয়, আমিও করি। আচ্ছা সাধুজী, আপনি আকাশে উড়তে পারেন?

সাধু বললেন, কী?

বিশ্বমামা আবার বললেন, আপনার তো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, আপনি আকাশে উড়তে পারেন? এখানে বসে মন্ত্র পড়লে তো মেঘেরা শুনতে পাবে না। কখন বৃষ্টি নামাতে হবে তা মেঘেরা বুঝবে কি করে?

সাধু বললেন, আমার আকাশে ওড়ার দরকার হয় না। এখানে বসে মন্ত্র পড়লেই কাজ হয়। পরশু দিনই আবার যজ্ঞ করবো, তখন দেখতে পাবে।

বিশ্বমামা বললেন, তা হলে এখানে আরও দু'দিন থেকে যেতে হয় দেখছি। সাধুজী, আমার সামনে আপনি যদি মন্ত্র পড়ে বৃষ্টি নামাতে পারেন, তা হলে আমি আমার একটা কান কেটে ফেলবো!

সাধু বললেন, তা হলে ধরে নাও, তোমার একটা কান কাটা গেছে! আজ আবার মেঘ জমছে। বৃষ্টি আমি নামাবই!

এই সময় বাড়ির মধ্য থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। সাদা প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরা। হাতে একটা নীল বর্ডার দেওয়া সাদা টুপি।

কথা থামিয়ে বিশ্বমামা কৌতূহলী হয়ে সেই লোকটির দিকে চেয়ে

রইলেন। তারপর তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি।

সন্তোষ মিত্র বললেন, এ আমার মাসতুতো ভাই সুবোধ!

বিশ্বমামা সুবোধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই বাড়িতে থাকেন?

সুবোধের বদলে সন্তোষ মিত্রই আবার বললেন, না, মাঝে মাঝে আসে। ও তো এয়ার ফোর্সের আফিসার। কলাইকুণ্ডার ফাইটার প্লেন চালায়।

বিশ্বমামা বললেন, আমারও দেখেই পাইলট মনে হয়েছিল। সুবোধ বাবু এখন তো যুদ্ধ চলছে না, তবু আপনাকে মাঝে মাঝেই আকাশে প্লেন ওড়াতে হয়?

সুবোধ বললো, তা তো হয়ই? ট্রায়াল দিতে হয়। আপনাকে তো চিনলাম না?

উত্তর না দিয়ে বিশ্বমামা-হো-হো হেসে উঠলেন, হাসি তো নয় অট্টহাস্য যাকে বলে!

সন্তোষ, সুবোধ দু'জনেই সেই হাসি শুনে হকচকিয়ে গেল। ভল্টুদাও এগিয়ে এলো কাছে।

বিশ্বমামা হাসি থামিয়ে সুবোধের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, ও সাধু-টাধুর কম্ম নয়। আপনিই বৃষ্টি নামাবার আসল ওস্তাদ। সলিড কার্বন ডাই অক্সাইড না সিলভার আয়োডাইড?

সুবোধও এবার মৃদু হেসে বললো, আপনি ধরে ফেলেছেন দেখছি!

বিশ্বমামা বললেন, আমি প্রথম থেকেই ভাবছি, আকাশে ওড়ার ব্যবস্থা না থাকলে তো বৃষ্টি নামানো সম্ভব নয়। এই তো একজন জলজ্যান্ত পাইলট পাওয়া গেছে!

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপারটা বুঝলি? মেঘ মানে কী! খুব ক্ষুদ্র জলকণা, তাই তো? সেই জলকণাগুলো জমাট বেঁধে বড় বড় ফোঁটা হয়ে বৃষ্টির মতন ঝরে পড়ে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি না হলে বৃষ্টি নামে না। কেউ যদি প্লেনে করে উড়ে গিয়ে সলিড কার্বন ডাইঅক্সাইড কিংবা সিলভার



আয়োডাইড মেঘে ছড়িয়ে দিতে পারে, তা হলেই জলকণাগুলো দানা বেঁধে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে! সুবোধবাবু কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে এসে এখানকার আকাশের মেঘে সেই জিনিস ছড়িয়ে দেন।

ভল্টুদা তবু আবিশ্বাসের স্বরে বললো, তা হলে, তা হলে সাধুর দরকার কী? সাধু মন্ত্র পড়লেন...

বিশ্বমামা বললেন, শুধু শুধ্ এই একটা বাগানের মাঝে মাঝে বৃষ্টি হবে, অন্য কোথাও হবে না, তাতে লোকের সন্দেহ হবে। সেই জন্যই একজনকে সাধু সাজিয়ে ভড়ং দেখানো দরকার। এখান দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেছে, তা কেউ লক্ষ করে নি। কী সুবোধবাবু, ঠিক বলছি?

সুবোধ এখনো হাসছে।

বিশ্বমামা বললেন, আপনি হাসছেন বটে। কিন্তু ঐ সাধুর বদলে আপনাকেই পুলিশের অ্যারেস্ট করা উচিত।

সুবোধ বললো ঃ কেন কেন কী অভিযোগ?

বিশ্বমামা বললেন, চুরি!

সুবোধ বললেন, চুরি? তার মানে? আমি কার কী চুরি করেছি। সিলভার আয়োডাইড আমি কিনি নিজের পয়সায়। আকাশের মেঘ কারুর সম্পত্তি নয়!

বিশ্বমামা বললেন, অবশ্যই মেঘ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই মেঘ থেকে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে আশে পাশে সবার জমিতে বৃষ্টি পড়তো। আপনি শুধু এই বাগানে বৃষ্টি ফেলে অন্যদের বঞ্চিত করছেন। বর্ষা শুরু হবার আগেই সন্তোষবাবুর বাগানে বৃষ্টি পড়ার ফলে তাঁর গাছগুলো বেশি বাড়ছে।

সন্তোষবাবু বললেন, আমি জানতাম না এটা একটা অপরাধ। আমি ভেবেছিলাম, এটা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।

বিশ্বমামা বললেন, ইচ্ছে মতন কেউ কেউ তার জমিতে আলাদা ভাবে বৃষ্টি ফেলিয়ে নিলে কিছুদিন পর সারা দেশে মারামারি শুরু হয়ে যাবে। সেই জন্যই ঐ পরীক্ষা এখন বন্ধ!

সুবোধের দিকে ফিরে বললেন, আপনি এয়ার ফোর্সের পাইলট। এয়ার ফোর্সের প্লেন এরকম ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করাটাও অপরাধ নয়? জানাজানি হলে আপনার চাকরি যাবে। অবশ্য সেটা জানাবার দায়িত্ব আমার নয়।

এখানে কী কথাবার্তা হচ্ছে সাধুজী তা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাবে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।

বিশ্বমামা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, বলেছিলাম না ভালো অভিনেতা। ঐ সাধুও বোধহয় এই সন্তোষবাবুর এক মাসতুতো ভাই।

বিলুদা বললো গোঁফ দাড়িগুলো আসল না নকল টান মেরে দেখবো!

ভল্টুদা বললে না, না, না, দরকার নেই, দরকার নেই।

